কবিতা

বাংলা কবিতার উদ্ভব ও বিকাশ : একটি রূপরেখা

নানা বিতর্ক ও ভিন্নমত থাকলেও, একথা আজ সকলেই মেনে নিয়েছেন যে বাংলা সাহিত্যের বয়স প্রায় দেড় হাজার বছর। পৃথিবীর সব সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেরও যাত্রা শুরু কবিতা দিয়ে। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ। আনুমানিক দেড় হাজার বছর পূর্বে এগুলো রচিত হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের রচিত এ পদগুলো দীর্ঘদিন অনাবিষ্কৃত ছিল। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এগুলো নেপাল রাজদরবারের পুঁথিশালা থেকে উদ্ধার করেন। চর্যাপদে প্রাচীন বাংলার সমাজ জীবনের নানা ছবি চিত্রিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বকথা অবলম্বনে রচিত হলেও, চর্যাপদগুলো সাহিত্যগুণেও অনন্য। চর্যাপদের প্রধান কবিরা হলেন লুইপাদ, ভুসুকুপাদ, কাহ্নপাদ ও সরহপাদ। চর্যাপদ ছাড়া প্রাচীন যুগের (৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দকে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ বলা হয়) আর কোন সাহিত্য নিদর্শন এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয়নি।

চর্যাপদের পর বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হচ্ছে বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্য। আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিকে এ কাব্য রচিত হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা মত প্রকাশ করেছেন। তবে চর্যাপদের মতোই এ কাব্যও রচনার বহু শতাব্দী পরে আবিষ্কৃত হয়। ১৯০৯ সালে বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে কাব্যের পুঁথিটি উদ্ধার করেন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। এটি রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক আখ্যানকাব্য। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*কে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের (১২০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ বলা হয়) প্রথম নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মধ্যযুগের বাংলা কবিতা প্রধানত চারটি শাখায় বিকাশ লাভ করে। এ শাখা চারটি হলো বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, রোমান্সমূলক প্রণয়-কাব্য এবং অনুবাদ-কাব্য। চর্যাপদ এবং *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের মতো এ-সব সাহিত্যশাখাও ধর্মচিন্তাকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করে। বৈষ্ণব ধর্মমতকে অবলম্বন করে রচিত হয় বৈষ্ণব পদাবলী। চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) মানবতাবাদী ধর্মচিন্তা বৈষ্ণব সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ প্রেরণা সঞ্চার করে। সাহিত্যগুণে বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। রাধা-কৃষ্ণের মর্ত্যলীলাকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলী। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান কবিরা হচ্ছেন- বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও বলরামদাস।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শাখা হচ্ছে মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্য রচনার পশ্চাতেও ধর্মীয় প্রেরণা কাজ করেছে। খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দ পর্যন্ত সময়ে রচিত হয় মঙ্গলকাব্য। বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার প্রচার সম্পর্কিত এক প্রকার আখ্যানকাব্যকে মঙ্গলকাব্য বলে। মধ্যযুগের মানুষ জাগতিক নানা প্রয়োজনে ও বিপদে-আপদে এ-সব দেব-দেবীর শরণাপন্ন হয়েছে। এভাবে হিংস্র শ্বাপদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য চণ্ডীদেবীর পরিকল্পনা, সাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য মনসাদেবীর অধিষ্ঠান, বসন্তরোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য শীতলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এরূপে আরও বহু দেব-দেবীর পরিকল্পনা করা হয়েছে। নানা দেব-দেবীর পরিকল্পনার কারণে মঙ্গলকাব্যেও রয়েছে নানা শাখা। *মনসামঙ্গল*, *চণ্ডীমঙ্গল*, *অন্নদামঙ্গল*, *শীতলামঙ্গল*, *শিবমঙ্গল*, *ধর্মমঙ্গল* প্রভৃতি হচ্ছে মঙ্গলকাব্যের প্রধান প্রধান শাখা। *মনসামঙ্গলের* প্রধান কবিরা হচ্ছেন বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, বিপ্রদাস প্রমুখ। *চণ্ডীমঙ্গলের* প্রধান কবি হচ্ছেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, যিনি কবিকঙ্কন নামে সমধিক পরিচিত। অন্নদামঙ্গলের প্রধান কবির নাম ভারতচন্দ্র রায়। মঙ্গলকাব্যসমূহ ধর্মীয় প্রেরণায় রচিত হলেও এ-সব কাব্যে মধ্যযুগের বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতার নানা দিক বিধৃত হয়ে আছে। সাহিত্যগুণেও এ-কাব্য বিশিষ্টতার পরিচয়বাহী। ধর্মীয় প্রেরণায় রচিত মধ্যযুগের সাহিত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য শাখা হচ্ছে অনুবাদ কাব্য। সংস্কৃত *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *ভাগবতের* অনুবাদের মাধ্যমে এ কাব্যশাখার সৃষ্টি। পঞ্চদশ শতাব্দ থেকে সপ্তদশ শতাব্দ পর্যন্ত অনুবাদকাব্য বিশেষ বিকাশ লাভ করে। রামায়ণ-মহাভারত ভাগবতের অনুবাদের মাধ্যমে নতুন জীবনাদর্শে সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন অনুবাদকারীরা। বাল্মীকির মূল *রামায়ণ* প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন কৃত্তিবাস ওঝা। পঞ্চদশ শতাব্দে তিনি *রামায়ণ* অনুবাদ করেন। *মহাভারতের* প্রথম বঙ্গানুবাদক হচ্ছেন কাশীরাম দাস। আরও অনেক কবি *রামায়ণ* ও *মহাভারত* অনুবাদ করে বাংলা অনুবাদ কাব্যের শাখাটি সমৃদ্ধ করেছেন।

মধ্যযুগে এ পর্যন্ত যে-সব সাহিত্যশাখার কথা আমরা জেনেছি, তার সবগুলোই হিন্দু ধর্মের বিষয় ও বিধানকে অবলম্বন করে রচিত। ইসলাম ধর্মের প্রসার ও প্রচারকল্পে সুফি ধর্মমতের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় এ-সময় মুসলিম কবিদের হাতে নতুন এক কাব্যশাখার সৃষ্টি হয়। সাহিত্যের ইতিহাসে এ কাব্যশাখা রোমান্সমূলক প্রণয়-কাব্য নামে পরিচিত। এগুলো মূলত আখ্যান কাব্য। বাংলা রোমান্সমূলক প্রণয়-কাব্যের ধারায় যাঁদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়, তাঁরা হচ্ছেন সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ আলাওল, মুহম্মদ কবীর, কাজী দৌলত, দৌলত উজির বাহরাম খান প্রমুখ। এঁদের মধ্যে সৈয়দ আলাওলের অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য। *পদ্মাবতী*, *হপ্তপয়কর* প্রভৃতি আলাওলের উল্লেখযোগ্য কাব্য। রোমান্সমূলক প্রণয়কাব্যসমূহ ধর্মীয় প্রেরণায় সৃষ্টি হলেও এগুলোর মধ্যেও মধ্যযুগের বাংলাদেশের বহুমাত্রিক সামাজিক পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়কে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আধুনিক যুগে এসে বাংলা সাহিত্য কেবল কবিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বহু বিচিত্র শাখায় বিচিত্রভাবে তা বিকাশ লাভ করে। তবে এখানে আমরা কেবল কবিতা সম্পর্কেই জানার চেষ্টা করবো। আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। তবে তাঁর পূর্বে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে বাংলা কাব্যে আবির্ভূত হন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)। এজন্য তাঁকে 'যুগ-সন্ধিক্ষণের' কবি বলা হয়। তিনি খণ্ড কবিতা রচনা করেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তই বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা হিসেবে সমধিক পরিচিত। তাঁর অমর কীর্তি *মেঘনাদবধ কাব্য* (১৮৬১)। এটিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য। তিনি পত্রকাব্য এবং সনেটেরও প্রবর্তক। *বীরাঙ্গনা কাব্য*, *ব্রজাঙ্গনা কাব্য*, *চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী* প্রভৃতি মাইকেল মধুসূদন দত্তের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রচনা।

মধুসূদন যেমন মহাকাব্য, পত্রকাব্য এবং সনেটের প্রবর্তক, বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪) তেমনি গীতিকবিতার প্রবর্তক। তার *সঙ্গীত শতক*-ই (১৮৬২) হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতিকবিতার সঙ্কলন। গীতিকবিতার প্রবর্তন করেছেন বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'ভোরের পাখি' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বিহারীলালের অন্যান্য কাব্যের নাম *বঙ্গ-সুন্দরী*, *নিসর্গ সন্দর্শন*, *বন্ধু বিয়োগ*, *সাধের আসন*, *সারদামঙ্গল* ইত্যাদি।

এ পর্বেই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) উজ্জ্বল আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা কাব্য নতুন নতুন মাত্রায় অভিষিক্ত হলো। দুই শতাব্দ জুড়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা বিস্তৃত। ১৯৭৬ সালে মাত্র পনের বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্য *বনফুল* প্রকাশিত হয়। তাঁর সর্বশেষ কাব্য *শেষলেখা* প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে। মাঝখানে রয়েছে পঞ্চাশের অধিক কাব্যগ্রন্থ। এ-সব কাব্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য *মানসী*, *সোনার তরী*, *চিত্রা*, *কল্পনা*, *ক্ষণিকা*, *গীতাঞ্জলি*, *বলাকা*, *পুনশ্চ*, *জন্মদিনে* প্রভৃতি। ১৯১৩ সালে *গীতাঞ্জলি* কাব্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ বিষয় ও প্রকরণে বাংলা কবিতার মান বহুগুণে সমৃদ্ধ করেন। মানবতাবাদী চিন্তায় রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের কবিতা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা, নিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নতুন-নতুন ছন্দোরীতি, বিস্ময়কর সংক্ষিপ্তরূপ, অলঙ্কারের স্বল্পতা এবং ভাবসংহতিতে শেষ পর্বের রবীন্দ্রকবিতা বিশিষ্ট ও উজ্জ্বল।

এ কালের অন্য তিনজন কবি রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে প্রকাশের একটা স্বতন্ত্র পথ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এ কবিত্রয় হচ্ছেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)। কবিতার বিষয় এবং আঙ্গিকে এঁরা রবীন্দ্রনাথের দূরবর্তী জগতের মানুষ। উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম কবি হিসেবে কায়কোবাদের (১৮৫৭-১৯৫১) অবদানও এখানে স্মরণীয়। *মহাশ্মশান* কাব্য রচনা করে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর অন্যান্য কাব্য হচ্ছে *অশ্রুমালা*, *অমিয়ধারা* প্রভৃতি। অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী চেতনা কায়কোবাদের কবি প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বিংশ শতাব্দের বিশ দশকের সর্বাপেক্ষা প্রবল-প্রাণ কবির নাম কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। বাংলা কবিতার ইতিহাসে তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত। নজরুল ইসলাম মূলত রোমান্টিক কবি। রোমান্টিকতার অন্তর-প্রেরণায় তিনি কখনো উচ্চারণ করেছেন বিদ্রোহের বাণী, কখনো-বা গেয়েছেন প্রেম সৌন্দর্যের গান। শব্দব্যবহার ও অলঙ্কার নির্মাণেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রধান প্রধান কাব্যের নাম *অগ্নিবীণা*, *সাম্যবাদী*, *ভাঙার গান*, *দোলন চাঁপা*, *পুবের হাওয়া*, *চক্রবাক*, *সিন্ধু-হিন্দোল*, *মরুভাস্কর* ইত্যাদি। এ পর্বের একজন উল্লেখযোগ্য কবি জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬)। পল্লিবাংলার জীবন ও বিশ্বাসকে অবলম্বন করে বাংলা কবিতায় তিনি সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারা নির্মাণ করেছেন। *রাখালী*, *নক্সী কাঁথার মাঠ*, *সোজন বাদিয়ার ঘাট* প্রভৃতি জসীমউদ্‌দীনের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

বিংশ শতাব্দের তিরিশের দশকে এসে বাংলা কবিতায় নতুন পরিবর্তন সূচিত হলো। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৯৩), অজিত দত্ত (১৯০৭-১৯৭৯), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) প্রমুখ এ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি। এঁরা তিরিশোত্তর কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। এঁদের কবিতার প্রধান প্রবণতা আধুনিক জীবনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-অবিশ্বাস রূপায়ণ ও রবীন্দ্র-বিরোধিতা। তিরিশোত্তর এ কবি সমাজের হাতে বাংলা কবিতা বিষয় ও আঙ্গিকে নতুন মাত্রা অর্জন করে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির ফলে বাংলা কবিতা দুটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। পূর্ব বাংলাকেন্দ্রিক কবিরা বাংলা কবিতার একটি স্বতন্ত্র ধারা নির্মাণে সচেষ্ট হলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এ ধারার কবিদের মধ্যে প্রবল প্রতিবাদী চেতনা সৃষ্টি করে। এ ধারার কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেযোগ্যা হলেন আবুল হোসেন, আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, সিকান্দার আবু জাফর, আবদুল গণি হাজারী, সানাউল হক, সৈয়দ শামসুল হক, আলাউদ্দিন আল-আজাদ, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আল মাহমুদ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রমুখ। ষাটের দশকের পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আরও অনেক কবি পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশ-কেন্দ্রিক কাব্যধারা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

হাজার বছরের বাংলা কবিতার ইতিহাস আমরা সংক্ষেপে ওপরের আলোচনায় তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। এ আলোচনা পাঠ করে আপনি কবিতা অধ্যয়ন করার চেষ্টা করুন, তাহলে পাঠ অনুধাবন আপনার জন্য সহজ হবে।

বঙ্গভাষা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবি-পরিচিতি

১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত এবং মাতা জাহ্নবী দেবী। মধুসূদনের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় সাগরদাঁড়ির গ্রামের পাঠশালায়। ১৮৩৩ সালে তিনি কলকাতার হিন্দু কলেজে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এ সময় তিনি ডিরোজিও প্রভাবিত ইয়ং-বেঙ্গল দল দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন এবং ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তিনি মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবজ্ঞা ও ইংরেজি ভাষার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। ১৮৪৩ সালে তিনি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর নামের প্রথমে যোগ হয় 'মাইকেল'। ধর্মান্তরিত হওয়ায় হিন্দু কলেজ ছেড়ে শিবপুরের বিশপ্‌স কলেজে ভর্তি হন এবং এখানে তিনি গ্রিক, লাতিন ও হিব্রু ভাষা শেখেন। এছাড়াও তিনি সংস্কৃত, ফরাসি, জার্মান ও ইতালীয় ভাষাতেও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ১৮৬২ সালে মধুসূদন ইংল্যান্ড যান এবং ব্যারিস্টারি পাস (১৮৬৬) করেন। লন্ডন থেকে তিনি ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে যান ও বেশ কয়েক বছর অবস্থান করেন। এ সময় তিনি চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটে পতিত হন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এ সময় অর্থ প্রেরণ করে মধুসূদনকে দেনার দায় থেকে মুক্ত করেন ও দেশে ফেরার ব্যবস্থা করেন। কলকাতার উচ্চ আদালতে আইন ব্যবসা করে দারিদ্র্যের যন্ত্রণা থেকে সাময়িক মুক্তি অর্জন করলেও শেষ জীবনে তিনি পুনরায় অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে নিপতিত হন। হাজার বছরের বাংলা কাব্যের প্রথাগত ধারায় মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথম বন্ধনমুক্তির অগ্রনায়ক। মধ্যযুগের কবিতায় চরণের শেষে অন্তমিল-সম্পন্ন পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের প্রথা ভেঙে তিনি প্রবর্তন করেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। আধুনিক বাংলা কবিতার অগ্রদূত হিসেবে বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে রেখে যান অক্ষয় অবদান। বিষয় ভাবনা, জীবনার্থ এবং প্রকরণ-শৈলীর স্বাতন্ত্র্যে মধুসূদনের রচনা আধুনিকতার শিখরস্পর্শী। মহাকাব্য, সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা, পত্রকাব্য, প্রহসন, ট্র্যাজেডি নাটক ইত্যাদি রূপকল্প বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ জুন কলকাতার আলীপুর জেনারেল হাসপাতালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কাব্যগ্রন্থ : *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য* (১৮৬০), *মেঘনাদবধ কাব্য* (১৮৬১), *ব্রজাঙ্গনা কাব্য* (১৮৬১), *বীরাঙ্গনা কাব্য* (১৮৬২), *চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী* (১৮৬৬);

নাটক : *শর্ম্মিষ্ঠা* (১৮৫৯), *পদ্মাবতী* (১৮৬০), *কৃষ্ণকুমারী নাটক* (১৮৬১);

প্রহসন : *একেই কি বলে সভ্যতা?* (১৮৫৯), *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* (১৮৫৯);

গদ্য-কাব্য : *হেকটর-বধ* (অসমাপ্ত)।

ভূমিকা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি *চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী* গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট। মাতৃভাষার প্রতি কবির সুগভীর হৃদয়াবেগ এই কবিতায় মার্জিত ও পরিশীলিত ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অজস্র ঐশ্বর্য ও সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত হয়েছে কবির নিপুণ বর্ণনায়।

উদ্দেশ্য

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বঙ্গভাষা' সনেটটি পড়ার পর আপনি–

- বাংলা ভাষায় কবির কাব্য রচনার যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- 'বিবিধ রত্নে' পরিপূর্ণ বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- 'বঙ্গভাষা' কবিতার কাব্যবৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;–
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, অনাহারে, সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;-
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন!

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,–
"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে।"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে॥

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অবরেণ্যে– যা বরণ বা গ্রহণযোগ্য নয়। বিদেশি ভাষাকে পরধন হিসেবে দেখেছেন বলেই কবি 'অবরেণ্যে' শব্দ প্রয়োগ করেছেন। প্রয়োগটিকে এই অর্থেও হয়ত নেওয়া যেতে পারে– যা বরণ করা বা গ্রহণ করা সাধ্য বা সামর্থ্যের বাইরে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন বহুভাষাবিদ বাঙালি। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ বহু সাহিত্যকর্মের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল; কিন্তু মাতৃভাষার চেয়ে বড়ো কিছু হতে পারে না– এই বোধই কবিকে তাঁর নিজের ভাষা-সাহিত্যের কাছে ফিরিয়ে এনেছিল। **অবোধ–** নির্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন। **আচরি–** আচরণ করে, অবলম্বন করে। **আজ্ঞা–** আদেশ, নির্দেশ। **এ ভিখারী-দশা–** কবি ভিখারীর মতো বিদেশি সাহিত্যের দুয়ারে হাত পেতেছিলেন। **কমল-কানন–** পদ্মবন। **কালে–** যথাসময়ে, একসময়ে। **কাটাইনু–** কাটালাম। **কায়–** দেহ, শরীর। **কেলিনু–** খেলা করলাম। **কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন–** কবি বাংলা ভাষাকে পদ্মের এবং ইংরেজি ভাষাকে শ্যাওলার সঙ্গে উপমিত করেছেন। কবির মন্তব্য : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে উপেক্ষা করে বিদেশি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করে তিনি ভুল করেছেন এবং তার সাধনা ব্যর্থ হয়েছে। এ যেন পদ্মবনকে উপেক্ষা করে শ্যাওলা নিয়ে খেলা করা। **কুললক্ষ্মী–** মাতৃভাষায় কবিতা রচনার দৈবী প্রেরণাকে কবি মাতৃভাষার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে কল্পনা করেছেন। **কুক্ষণে–** অশুভ সময়ে, অনভিপ্রেত মুহূর্তে। **তা সবে–** সে সবকে, সেগুলোকে। **পরদেশে–** বিদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে, ইউরোপে কবির প্রবাস জীবনের কথা এখানে বলা হয় নি। কারণ সাহিত্য জীবনের শেষে অর্থোপার্জনের আশায় কবি দেশত্যাগ করেছিলেন। **পরধন-লোভে মত্ত–** পরের সম্পদের লোভে অতিমাত্রায় আকৃষ্ট। পরধন

বলতে পাশ্চাত্য সাহিত্যকে বুঝিয়েছেন। কবি মধুসূদনের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা ছিল ইংরেজি সাহিত্যের কবি হবার। তাই তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাব-সম্পদ আহরণে মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর সাহিত্য-সাধনার সূচনা হয়েছিল ইংরেজি সাহিত্য রচনার মাধ্যমে। পরে ভুল বুঝতে পেরে বাংলা সাহিত্যের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। **পরিহরি–** পরিহার করে, ত্যাগ করে, এখানে বঞ্চিত হয়ে। **পালিলাম–** পালন করলাম, মান্য করলাম। **বরি–** বরণ করে। কবি মধুসূদন তাঁর সাহিত্য-চর্চার শুরুতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। মাদ্রাজে থাকাকালে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেন বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নে। মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করার জন্যে যে প্রয়াস সে সময়ে তিনি চালিয়েছিলেন তা যে ব্যর্থ প্রয়াস ছিল তা তিনি শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারেন। এখানে আক্ষেপের সুরে সে কথাই বলেছেন তিনি। **বিফল তপে–** নিষ্ফল বা ব্যর্থ তপস্যায়। **ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন–** বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য-ভাণ্ডার বৈচিত্র্যময় ও উৎকর্ষমণ্ডিত সাহিত্য-সম্পদে পরিপূর্ণ। **ভিক্ষাবৃত্তি–** বিদেশি সাহিত্যকে পরধন বিবেচনা করায় তার চর্চাকে তিনি ভিক্ষাবৃত্তির সমতুল্য মনে করেছেন। নিজের সম্পদকে উপেক্ষা করে অন্য ভাষার সম্পদের দ্বারস্থ হওয়ার জন্য অনুশোচনা ও আত্মসমালোচনার বোধ এখানে প্রকাশিত হয়েছে। **মজিনু–** মগ্ন হলাম, বিভোর হলাম, অত্যধিক আসক্ত হলাম। **মনঃ–** মন, অন্তর, অন্তঃকরণ, চিত্ত। **মাতৃকোষে–** মাতৃভাষার ভাণ্ডারে অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে। **যা রে ফিরি ঘরে–** মাতৃভাষার সাহিত্য সৃষ্টির কাজে ব্রতী হও। **মাতৃভাষা রূপ-খনি, পূর্ণ মণিজালে–** মাতৃভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডার যেন খনির মতো অনন্ত রত্নসম্পদের আকর। খনি থেকে যেমন বিচিত্র রত্নরাজি লাভ করা যায় তেমনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অজস্র ঐশ্বর্য ও সম্ভাবনায় ভরপুর। বাংলা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন বলে যেসব সুকাব্যের কথা কবি তাঁর 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'-তে উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হল : কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল', ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', কাশীরাম দাসের 'মহাভারত', কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', কালিদাসের 'মেঘদূত' ও জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'। **রতনের রাজি–** রত্নসমূহ অর্থাৎ বিচিত্র ঐশ্বর্যময় সাহিত্য নিদর্শনগুলো। **শৈবাল–** শ্যাওলা। **সঁপি–** সঁপে, সমর্পণ করে। **স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী করে দিলা পরে–** মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চার মূলে কবি যে গভীর প্রেরণা অনুভব করেছিলেন তাকে কবি বাংলা ভাষার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্বপ্নাদেশ বলে কল্পনা করেছেন। **হে বঙ্গ–** বঙ্গ বলতে কবি বাংলা ভাষাকেই বুঝিয়েছেন এবং তাকেই সম্বোধন করেছেন।

সারসংক্ষেপ

স্বদেশের প্রতি, মাতৃভাষার প্রতি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ ফুটে উঠেছে এই কবিতার প্রতিটি চরণে। এখানে কবি শুধু তাঁর সুগভীর হৃদয়াবেগই প্রকাশ করেননি, সবকিছু ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে মাতৃভাষার মহিমা এবং সুগভীর দরদ। স্বদেশ ও স্বভাষাকে অবহেলা করে কবি ভিনদেশি সাহিত্যে খ্যাতি অর্জনের চেষ্টা করেন। তাতে ব্যর্থ হওয়ায় একদা তাঁর মধ্যে শুভবোধ জাগ্রত হয়। তিনি বুঝতে সক্ষম হন মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে বিদেশি-ভাষা চর্চার মাধ্যমে পূর্ণ সফলতা সম্ভব নয়। বরং মাতৃভাষা চর্চার মাধ্যমেই কাঙ্ক্ষিত সফলতা লাভ করা যায়। কবি বিদেশি ভাষাকে পরধন বলে আখ্যায়িত করে সেই ধন লাভ করার চেষ্টাকে ভিক্ষাবৃত্তির সামিল মনে করেছেন। মাতৃভাষা বাংলা বিবিধ রত্নে পরিপূর্ণ। বাংলা ভাষার যে ঐশ্বর্য রয়েছে তা নিয়েই নির্মিত হতে পারে কালজয়ী সাহিত্য। তাই এ কবিতাটিতে কবি মূলত মাতৃভাষা ভুলে গিয়ে অন্য ভাষায় সাহিত্য রচনার ব্যর্থতা এবং মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনার পরিতৃপ্তির কথা বলেছেন। এই কবিতায় কবির ব্যক্তি-জীবনের প্রভাব পড়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১.'সঁপি' শব্দের অর্থ কী?

ক. অর্পণ করে
খ. সমর্পণ করে
গ. বরণযোগ্য
ঘ. বিবিধ রতন

২. কবি 'কমল-কানন' বলতে বুঝিয়েছেন–

ক. ফরাসি সাহিত্য
খ. শ্যাওলাবন
গ. পদ্মবন
ঘ. বাংলা সাহিত্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মাগো তোমার কোলে, তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালোবাসা, আ-মরি বাংলা ভাষা।

৩. উদ্দীপকটির ভাব যে চরণে প্রতিফলিত হয়েছে–

ক. পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
খ. হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
গ. কত নদী সরোবর, কিবা জল চাতকীর
ঘ. বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী

৪. উদ্দীপক ও 'বঙ্গভাষা' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে–

i. ভাষাপ্রীতি
ii. বিত্তবাসনা
iii. প্রকৃতিপ্রীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও ii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫.'সনেট' হচ্ছে কবিতার একটি–

ক. বিশেষ রূপকল্প
খ. আত্মসমালোচনা
গ. তাত্ত্বিক আলোচনা
ঘ. বিশেষ চিত্রকল্প

৬. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে 'মাতৃভাষার'–

i. সৌন্দর্য
ii. মাধুর্য
iii. মহিমা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় সে- যে মায়ের মুখের ভাষা।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বঙ্গভাষা' কবিতার মিল রয়েছে–

ক. শিল্পরূপে
খ. ভাবে
গ. চিত্রকল্পে
ঘ. উৎপ্রেক্ষায়

৮. উদ্দীপক ও 'বঙ্গভাষা' কবিতার তাৎপর্য হচ্ছে–

ক. মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ
খ. কবির সাফল্য ও ব্যর্থতা
গ. কবির আত্মসমালোচনা
ঘ. প্রথাবিরোধী মানসিকতা

সৃজনশীল প্রশ্ন :

আমি বাংলায় ভালোবাসি
আমি বাংলাকে ভালোবাসি
আমি তারই হাত ধরে
সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আসি
আমি যা কিছু মহান বরণ করেছি

বিনম্র শ্রদ্ধায়
মেশে তের নদী সাত সাগরের জল
গঙ্গায় পদ্মায়।

ক. 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
খ. 'মাতৃকোষে রতনের রাজি' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বঙ্গভাষা' কবিতার সাদৃশ্য নিরূপণ করুন।
ঘ. "উদ্দীপকে 'বঙ্গভাষা' কবিতার মূলভাব প্রকাশিত হয়েছে।" –মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক.

'বঙ্গভাষা' কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।

খ.

'মাতৃকোষে রতনের রাজি' বলতে কবি বাংলা ভাষার ঐশ্বর্যময় সাহিত্য-নিদর্শনগুলোকে বুঝিয়েছেন।

'বঙ্গভাষা' কবিতায় অনুশোচনাদগ্ধ কবি উপলব্ধি করেছেন তাঁর মাতৃভাষার সাহিত্যের সমৃদ্ধি। তাঁর মতে বাংলা সাহিত্যে রচিত কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল', ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', কাশীরাম দাসের 'মহাভারত', কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' ইত্যাদি অমূল্য রত্ন। কবি মধুসূদন বাংলা ভাষার এসব চিরায়ত সাহিত্যকর্মকে 'মাতৃকোষে রতনের রাজি' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

গ.

'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবির মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অপরিমেয় ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে, যা উদ্দীপকেও ফুটে উঠেছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম জীবনে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। বস্তুত বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতে গিয়েই তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। অবশ্য মাতৃভাষায় কাব্যচর্চার পেছনে তাঁর অন্তরে জমে থাকা গভীর দেশপ্রেম নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছে।

উদ্দীপকের কবিতার চরণগুলোতে দেশপ্রেমের অফুরন্ত নিদর্শন রয়েছে। উদ্দীপকের কবিতায় কবি বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশকে ভালোবাসার কথা বলেছেন। দেশপ্রেমের দৃষ্টিকোণ হতে এখানে প্রকৃতিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। উদ্দীপকে বলা হয়েছে সব নদীর জল যেমন সাগর সঙ্গমে এসে মিলিত হয় তেমনি বাঙালি জাতি ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত হলেও অভিন্ন আত্মার বন্ধনে বিশ্বাসী। এছাড়া উদ্দীপকে বাংলার মানুষের সঙ্গে বিশ্বমানবের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে 'বঙ্গভাষা' কবিতায়ও মাইকেল মধুসূদনের হৃদয়ে সঞ্চিত গভীর দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কবিতাটিতে কবিহৃদয়ের সত্তা বাংলা ভাষায় আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে পূর্ণতার আনন্দ লাভ করেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সঙ্গে 'বঙ্গভাষা' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ.

উদ্দীপক ও 'বঙ্গভাষা' কবিতায় মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাপ্রীতির অন্তরালে দেশপ্রেম প্রকাশিত হওয়ায় উভয়ের মূলভাব একই রকম হয়েছে।

'বঙ্গভাষা' কবিতাটিতে বাংলা ভাষার মাধুর্য ও এর প্রতি গভীর অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। এতে মাতৃভাষাকে ঘিরে কবির জীবনে যে আত্মোপলব্ধি ঘটেছিল তারও বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। এ কবিতায় মূলত মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের মধ্য দিয়ে দেশমাতৃকার প্রতিই গভীর মমত্ববোধ ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে দেশপ্রেমের এক অনিন্দ্য সুন্দর উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে স্বভাষা, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগের মধ্য দিয়ে। উপরন্তু উদ্দীপকে রয়েছে বিশ্বমানবতার প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধ। অন্যদিকে 'বঙ্গভাষা' কবিতায় দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় স্বভাষাপ্রীতির অনুষঙ্গে। উদ্দীপক ও 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উভয় স্থানেই দেশপ্রেম প্রধান হয়ে উঠেছে। অবশ্য উদ্দীপক ও কবিতাটিতে প্রকাশভঙ্গির দিক দিয়ে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।

উদ্দীপকে কবির চেতনায় বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের প্রতি তীব্র অনুরাগ লক্ষ করা যায়। এখানে অভিন্ন বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া বাঙালি জাতিসত্তার সঙ্গে সংযোগ সাধন করা হয়েছে সর্বমানবের। 'বঙ্গভাষা' কবিতায়ও মাইকেল মধূসূদন দত্ত উপলব্ধি করেছেন যে, মাতৃভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করা গৌরবের। তাই কবিতায় তিনি মাতৃভাষার বন্দনা করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশপ্রেমকেও তুলে ধরেছেন। কবিতার প্রবহমাণ পটভূমিতে কবি মাতৃভাষার ঐশ্বর্যের প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব করেছেন। কবিতার এ বিষয়গুলো দেশপ্রেমেরই উদাহরণ, যা উদ্দীপককে স্মরণ করিয়ে দেয়। অতএব, পর্যালোচনা শেষে একথা বলা যায় যে, উদ্দীপকে 'বঙ্গভাষা' কবিতার মূলভাব প্রকাশিত হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশ ন যায় ॥
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি ॥

ক. বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনা করেন কে?
খ. 'পালিলাম আজ্ঞা সুখে' বলতে কী বোঝায়?
গ. 'বঙ্গভাষা' কবিতার কোন চেতনার সঙ্গে উদ্দীপকের মিল রয়েছে? –ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. "উদ্দীপক ও 'বঙ্গভাষা' কবিতার কবি চেতনার দিক থেকে এক অভিন্ন সত্তা।" –মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. গ ৩. ক ৪. ক ৫. ক ৬. ঘ ৭. খ ৮. ক

সোনার তরী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

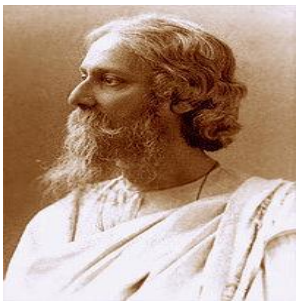

কবি-পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ বাবা-মা'র চতুর্দশ সন্তান ও অষ্টম পুত্র। তাঁর পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবী। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমী প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার জন্য পাঠানো হলেও বিদ্যালয়ের পড়ালেখার প্রতি তিনি মনোযোগী ছিলেন না। ঠাকুর বাড়ির অনুকূল পরিবেশে শৈশবেই রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। ১৮৭৬ সালে পনের বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *বনফুল*। অতঃপর কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, ভ্রমণসাহিত্য, রম্যরচনা, সঙ্গীত ইত্যাদি শাখায় রবীন্দ্রনাথ রেখে গেছেন তাঁর অসামান্য শিল্প-প্রতিভার স্বাক্ষর। বাংলা কবিতাকে তিনিই প্রথম দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রসারিত করেন। কবিতার বিষয়বস্তু এবং প্রকাশরীতিতে রবীন্দ্রনাথের নিত্য-নতুন পরীক্ষা বাংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছে। কেবল সাহিত্যিক হিসেবেই নয়, একজন কর্মযোগী মানুষ হিসেবেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্য কীর্তির পরিচয় রেখে গেছেন। ১৯০১ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়'। এটিই পরবর্তীকালে 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়'-এ রূপলাভ করে। *গীতাঞ্জলি* ও অন্য কিছু কবিতার সমন্বয়ে স্ব-অনূদিত Song Offerings গ্রন্থের জন্য ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে প্রথম কৃষিব্যাংক স্থাপন করেন। বাংলাদেশের শিলাইদহ, পতিসর এবং শাহজাদপুরে জমিদারি তত্ত্বাবধান সূত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত করেন। গীতিকার ও চিত্রশিল্পী হিসেবেও রবীন্দ্রনাথের অবদান অনন্যসাধারণ। ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ) কলকাতায় তিনি পরলোকগমন করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কাব্যগ্রন্থ	:	*মানসী* (১৮৯০), *সোনার তরী* (১৮৯৪), *চিত্রা* (১৮৯৬), *ক্ষণিকা* (১৯০০), *গীতাঞ্জলি* (১৯১১) *বলাকা* (১৯১৬), *পুনশ্চ* (১৯৩২), *জন্মদিনে* (১৯৪১), *শেষলেখা* (১৯৪১);
উপন্যাস	:	*চোখের বালি* (১৯০৩), *গোরা* (১৯১০), *ঘরে-বাইরে* (১৯১৬), *শেষের কবিতা* (১৯২৯);
ছোটগল্প	:	*গল্পগুচ্ছ* (১ম ও ২য় খণ্ড-১৯২৬, ৩য় খণ্ড-১৯২৭), *তিনসঙ্গী* (১৯৪১), *গল্পসল্প* (১৯৪১);
নাটক	:	*বিসর্জন* (১৮৯০), *চিত্রাঙ্গদা* (১৮৯২), *অচলায়তন* (১৯১২), *ডাকঘর* (১৯১২), *রক্তকরবী* (১৯২৬);
প্রবন্ধ	:	*আধুনিক সাহিত্য* (১৯০৭), *কালান্তর* (১৯৩৭), *সাহিত্যের স্বরূপ* (১৯৪৩);
আত্মজীবনী	:	*জীবন স্মৃতি* (১৯১২), *ছেলেবেলা* (১৯৪০)।

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কবিতাটি 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের নামকবিতা। এই কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর অধিকাংশ পঙ্‌ক্তি ৮+৫ মাত্রা পূর্ণপর্বে বিন্যস্ত। সুদীর্ঘ কাল ধরে এই কবিতাটি অনেক আলোচনা ও ব্যাখ্যায় নতুন নতুন তাৎপর্যে অভিষিক্ত। এই কবিতাটিতে কবির জীবনদর্শন অপূর্ব মহিমায় প্রকাশিত হয়েছে। মহাকালের স্রোতে জীবন-যৌবন ভেসে যায়, কিন্তু মানুষের সৃষ্ট কর্ম বেঁচে থাকে অনন্তকাল।

উদ্দেশ্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কবিতাটি পড়ার পর আপনি–

- রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতার মূলভাব লিখতে পারবেন।
- এ কবিতায় কবির যে জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সোনার ধানের সম্ভার নিয়ে অপেক্ষারত নিঃসঙ্গ ও আশাহত কৃষকের মনোবেদনার কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা
খরপরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা,
চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা ॥
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়ামসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাতবেলা–
এপারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা।

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা পালে চলে যায়,
কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দু ধারে–
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

ওগো, তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে,
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।
যেয়ো যেথা যেতে চাও,
যারে খুশি তারে দাও,
শুধু তুমি নিয়ে যাও

ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে।

যত চাও তত লও তরণী-'পরে।
আর আছে? –আর নাই, দিয়েছি ভরে
এতকাল নদীকূলে
যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলই দিলাম তুলে
থরে বিথরে–
এখন আমারে লহো করুণা করে।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই– ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধারে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণগগন ঘিরে
ঘন মেঘে ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি–
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

(শিলাইদহ। বোট। ফাল্গুন ১২৯৮)

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

আমি একলা– কৃষক কিংবা শিল্পস্রষ্টা কবির নিঃসঙ্গ অবস্থা। **আমার সোনার ধান–** কৃষকের শ্রেষ্ঠ ফসল। ব্যঞ্জনার্থে শিল্পস্রষ্টা কবির সৃষ্টিসম্ভার। **আর আছে আর নাই, দিয়েছি ভরে–** ছোট জমিতে উৎপন্ন ফসলের সবটাই অর্থাৎ কবির সমগ্র সৃষ্টি তুলে দেওয়া হয়েছে মহাকালের স্রোতে ভেসে আসা সোনার তরী-রূপী চিরায়ত শিল্পলোকে। **এখন আমারে লহো করুণা করে–** ফসল বা সৃষ্টিসম্ভার তুলে দেওয়া হয়েছে নৌকায়। এখন ফসল বা সৃষ্টির স্রষ্টা স্থান পেতে চায় ওই মহাকালের নৌকায়। **ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে?–** নির্বিকার মাঝির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কৃষক বা কবির চেষ্টা। 'বিদেশ' এখানে চিরায়ত শিল্পলোকের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। **কোনো দিকে নাহি চায়–** মহাকালের প্রতীক এই মাঝি নিরাসক্ত বলেই তার সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিপাত নেই। **ক্ষুরধারা–** ক্ষুরের মতো ধারালো যে প্রবাহ বা স্রোত। **খরপরশা–** ধারালো বর্শা। **গরজে–** গর্জন করে। **গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে–** ক্ষুরের মতো ধারালো জলস্রোতে গান গাইতে গাইতে যে মাঝি পারের দিকে এগিয়ে আসছে, রবীন্দ্র-ভাবনায় সে নির্মোহ মহাকালের প্রতীক। **চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা–** ধানক্ষেতটি ছোট দ্বীপের আঙ্গিকে চিত্রিত। তার পাশে ঘূর্ণায়মান স্রোতের উদ্দামতা। নদীর 'বাঁকা' জলস্রোতে বেষ্টিত ছোট ক্ষেতটুকুর আশু বিলীয়মান হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে এ অংশে। 'বাঁকা জল' এখানে অনন্ত কালস্রোতের প্রতীক। **ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট সে তরী–** সোনার তরীতে মহৎ সৃষ্টিরই স্থান সংকুলান হয় কেবল। ব্যক্তিসত্তা ও তার শারীরিক অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাবে হতে হয় মহাকালের নিষ্ঠুর কালগ্রাসের শিকার। **তরুছায়ামসীমাখা–** ওপারের মেঘে ঢাকা গ্রামটি যেন গাছের ছায়ার কালো রঙে মাখানো। **থরে বিথরে–** স্তরে স্তরে, সুবিন্যস্ত করে। **দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে–** এই আগন্তুক মাঝি কৃষক বা শিল্পস্রষ্টা কবির হয়ত চেনা। কেননা, চেনা মনে হলেও কৃষক বা শিল্পস্রষ্টা কবির সংশয় থেকেই যায়। **বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে–** চিরায়ত শিল্পলোকে ঠাঁই পাওয়ার জন্যই কৃষকরূপী কবির ব্যাকুল অনুনয় এখানে প্রকাশিত। **ভারা ভারা–** 'ভারা' অর্থ ধান রাখার পাত্র, এরকম পাত্রের সমষ্টি বোঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। **ভরসা–** আশা, নির্ভরশীলতা। **শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি–** নিঃসঙ্গ অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে আসন্ন ও অনিবার্য মৃত্যুর প্রতীক্ষার ইঙ্গিত। এ

প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "মহাকাল আমার সর্বস্ব লইয়া যায় বটে, কিন্তু আমাকে ফেলিয়া যায় বিস্মৃতি ও অবহেলার মধ্যে। ...সোনার তরীর নেয়ে আমার সোনার ধান লইয়া যায় খেয়াপারে, কিন্তু আমাকে লয় না।

সারসংক্ষেপ

বাংলা কবিতার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' একটি চিরায়ত আবেদনবাহী কবিতা। এ কবিতায় চারপাশের প্রবল স্রোতের মধ্যে জেগে থাকা দ্বীপের মতো একটি ধানখেতে নিঃসঙ্গ এক কৃষক তার উৎপন্ন ধানের সম্ভার নিয়ে অপেক্ষমাণ। পাশের খরস্রোতা নদী আকাশের ঘন মেঘ আর ভারী বর্ষণে হিংস্র হয়ে উঠেছে। চারদিকের 'বাঁকাজল' অনন্ত কালস্রোতের প্রতীক হিসেবে কৃষকের মনে ঘনঘোর সৃষ্টি করেছে। খরস্রোতা নদীতে তখন ভরাপাল সোনার নৌকা নিয়ে বেয়ে আসা এক মাঝিকে দেখা যায়। চিন্তিত কৃষক মাঝিকে সকাতরে অনুরোধ করে নৌকা কূলে ভিড়িয়ে তার উৎপাদিত সোনার ধান নিয়ে যাওয়ার জন্য। মাঝি সোনার ধান মহাকালের নৌকায় তুলে নিয়ে চলে গেলেও নৌকা ছোট বলে তাতে স্থান হয় না কৃষকের। আশাহত কৃষক শূন্য নদীর তীরে নিঃসঙ্গ অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে আসন্ন ও অনিবার্য মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পড়ে রইলেন। কবির উপলব্ধি হয়– মহাকালের স্রোতে মানুষের জীবন-যৌবন নিষ্ঠুরভাবে ভেসে গেলেও এই পৃথিবীতে মানুষেরই সৃষ্ট সোনার ফসল, তথা তাঁর দর্শন, কর্মযজ্ঞ বেঁচে থাকে চিরকাল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

ক. স্বরবৃত্ত　　খ. মাত্রাবৃত্ত
গ. অক্ষরবৃত্ত　　ঘ. গদ্যছন্দ

২. 'তরুছায়ামসী-মাখা' কেন বলা হয়েছে?

ক. ছায়াসুনিবিড় পরিবেশকে উপস্থাপন করার জন্য　　খ. মেঘলা আবহাওয়াকে নির্দেশ করার জন্য
গ. বৃক্ষ ছায়ার কালচে রং মাখাকে বোঝানোর জন্যে　　ঘ. পল্লবায়িত বৃক্ষকে তুলে ধরার জন্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মাদার তেরেসা আজীবন মানবতার জয়গান গেয়েছেন। মানবসেবার জন্য গড়ে তুলেছেন অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। তিনি তাঁর কর্ম ও সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীতে অমর হয়ে রয়েছেন।

৩. উদ্দীপকের মূলভাব কোন পংক্তির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা　　খ. একখানি ছোটো খেত আমি একেলা
গ. আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি　　ঘ. দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে

৪. উদ্দীপক ও 'সোনার তরী' কবিতায় যে ভাব প্রকাশিত হয়েছে–

i. মানুষের জীবনবোধ যন্ত্রণাময়
ii. ব্যক্তিসত্তা নয় টিকে থাকে মানুষের কীর্তি
iii. কালপ্রবাহকে মানুষ এড়াতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i ও ii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'থরে বিথরে' শব্দগুচ্ছ কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. রাশি রাশি　　খ. বোঝা বোঝা
গ. স্তরে স্তরে　　ঘ. সারি সারি

৬. 'সোনার তরী' কবিতায় কৃষক মাঝিকে কী অনুরোধ করেছিল?

ক. কৃষকের সঙ্গে গল্প করতে
খ. কৃষকের ভয় দূর করে দিতে
গ. সোনার ধান নৌকায় তুলে দিতে
ঘ. সোনার পাট নৌকায় তুলে দিতে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে
আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে?

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে কোন চরণের মিল রয়েছে?

ক. গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাত বেলা
খ. যত চাও তত লও তরণী-'পরে
গ. শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি
ঘ. যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী

৮. উদ্দীপক ও 'সোনার তরী' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে–

i. বর্ষার প্রকৃতি
ii. নিঃস্ব কৃষক
iii. সৃষ্টিশীল কর্ম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
গ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে চির তারুণ্যের প্রতীক। চিরায়ত বাঙালির সংস্কৃতি তাঁর কাব্যকর্মে স্ফূর্তি লাভ করেছে। বিদ্রোহ, সাম্য ও মানবতাবোধের কথা লিখে তিনি বাঙালি চিত্তে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন কাল থেকে কালান্তরে। তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে ১৯৭৬ সালে। অথচ তাঁর সৃষ্টিকর্ম এখনো বাঙালি জাতির চেতনার ফল্গুধারা। তাঁর কবিতা ও গান এখনও বাংলার মানুষের চেতনার অফুরান উৎস। তিনি তাঁর সৃষ্টিশীল কর্মে আমাদের মাঝে অমর হয়ে আছেন।

ক. 'সোনার তরী' কবিতায় কোন ঋতুর কথা বলা হয়েছে?
খ. 'যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী' –কথাটির মাধ্যমে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
গ. 'সোনার তরী' কবিতার জীবনদর্শন উদ্দীপকে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "মহৎ কর্মই পৃথিবীতে মানুষকে অমরত্ব দান করে।" –উদ্দীপক ও 'সোনার তরী' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক.

'সোনার তরী' কবিতায় বর্ষা ঋতুর কথা বলা হয়েছে।

খ.

মহাকাল মানুষকে নয়, বরং তার সৃষ্টিশীলতাকে ধারণ করে। আলোচ্য চরণটির মাধ্যমে এ সত্যটিকেই তুলে ধরা হয়েছে।

'সোনার তরী' কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লিখিত চরণে রূপকের আড়ালে একটি গভীর জীবন দর্শনকে প্রকাশ করেছেন। কবিতায় দেখা যায়, সোনার তরীর মাঝি কৃষকের সব ফসল তরীতে তুলে নেয় কিন্তু তরীতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ধানক্ষেতে একাকী দাঁড়িয়ে থাকে কৃষক। এখানে সোনার তরী মহাকালের প্রতীক। এ তরীতে শুধু মানুষের সৃষ্টিকর্মের ঠাঁই হয়, কোনো ব্যক্তিসত্তা নয়। তাই ব্যক্তি মানুষ তথা কবিতায় বর্ণিত কৃষককে ধানক্ষেতে একাকী অপেক্ষমান রেখে তার সোনার ধান অর্থাৎ সৃষ্টিকর্মকে সোনার তরী বয়ে নিয়ে যায়।

গ.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কবিতায় অন্তর্লীন হয়ে রয়েছে একটি গভীর জীবন দর্শন। এটি উদ্দীপকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

'সোনার তরী' কবিতাটিতে রূপকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে মানব জীবনের এক শ্বাশত দর্শন। কবিতার রূপকল্পে রয়েছে বর্ষার স্রোত পরিবেষ্টিত ধানক্ষেতে রাশি রাশি সোনার ধান নিয়ে অপেক্ষা করছে একজন কৃষক। অপেক্ষার একপর্যায়ে ভরা পালে তরী বেয়ে চলে যেতে থাকা এক মাঝিকে ধানগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে সে। কিন্তু মাঝি কেবল কৃষকের ধানগুলো তরীতে ভরে নেয়। সোনার তরীতে স্থানের অভাবে কৃষকের আর ওঠা হয় না।

কবিতায় সোনার তরী হচ্ছে প্রবহমান সময়ের প্রতীক। মানুষ একদিন এই পৃথিবী থেকে চলে যাবে। কিন্তু এখানে টিকে থাকবে কেবল তার সোনার ধান তথা কর্মফল। 'সোনার তরী' কবিতার এ ভাবটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে। উদ্দীপকে বর্ণিত কাজী নজরুল ইসলাম ব্যাক্তিমানুষ হিসাবে বেঁচে নেই কিন্তু টিকে আছে তাঁর সৃষ্টিকর্ম। বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহ, সাম্য ও মানবতাবোধের কথা লিখে তিনি আজও প্রেরণা যোগাচ্ছেন সাধারণ মানুষকে। তাঁর অবিনাশী গান, ধ্রুপদী কবিতা এখনও বাংলাভাষী পাঠকের চিরপ্রেরণার উৎস। যেকোন আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর সৃষ্টিকর্ম আমাদের চেতনার প্রদীপ্ত শিখা। তাই বলা যায়, কবিতাটির অন্তর্নিহিত জীবন দর্শন উদ্দীপকে যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ.

উদ্দীপক ও 'সোনার তরী' কবিতা উভয়টিতে ফুটে উঠেছে যে, মহৎ কীর্তিই মানুষকে পৃথিবীতে অমরত্ব প্রদান করে।

পৃথিবীতে মানুষ বেঁচে থাকে তাঁর কর্মের মাধ্যমে। কেননা, মহাকালের চিরন্তন স্রোতে মানুষ তার অনিবার্যতাকে এড়াতে পারে না। অতৃপ্তির বেদনা নিয়ে তাকে অপেক্ষা করতে হয় কালস্রোতে বিলীন হওয়ার জন্য। মহাকালরূপী সোনার তরী শুধু মানুষের সৃষ্টিকেই ধারণ করে, ব্যক্তি-মানুষকে নয়।

কবিতায় কৃষক তাঁর জমি থেকে সোনার ধান কেটে অপেক্ষায় আছে কখন তরী এসে সোনার ফসলসহ তাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে তরীতে সমস্ত ফসল তোলা হলে সেখানে কৃষকের জন্য আর এতটুকু জায়গাও অবশিষ্ট থাকে না। অর্থাৎ মহাকালের স্রোতে ব্যক্তি-মানুষ বা কবিতার কৃষক হারিয়ে যায় ঠিকই কিন্তু বেঁচে থাকে তার সোনার ধান বা কর্মফসল। কবিতায় বর্ণিত এ কর্মফসল উদ্দীপকের কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিকর্মের সমতুল্য। কালের স্রোতে ব্যক্তি নজরুল হারিয়ে গেলেও তাঁর কীর্তির মধ্য দিয়ে তিনি অমরত্ব পেয়েছেন ।

উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সাহিত্যে বিদ্রোহ, সাম্য ও মানবতাবোধের কথা বলেছেন। তাঁর সৃষ্টিকর্ম সমাজ পরিবর্তন ও জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে শ্রেণিসংগ্রাম ও স্বাধিকার আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছে। তাঁর কবিতা ও গান বর্তমানেও বাঙালির প্রতিদিনকার চেতনার অফুরন্ত উৎস। তিনি তাঁর মহৎ সৃষ্টিকর্মের জন্যই এখনও বেঁচে আছেন বাঙালির হৃদয়ে। 'সোনার তরী' কবিতায়ও প্রকাশিত হয়েছে একই জীবন দর্শন। তাই উদ্দীপক এবং 'সোনার তরী' কবিতার আলোকে বলা যায়, মহৎ কর্মই মানুষকে পৃথিবীতে অমরত্ব দান করে।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর
আউশের খেত জলে ভরভর,
কালি-মাখা মেঘে ওপারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ চাহি রে।

ক. 'গীতাঞ্জলি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন জাতীয় রচনা?
খ. 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।' –উক্তিটির তাৎপর্য লিখুন।
গ. 'সোনার তরী' কবিতার কোন দিকটির সঙ্গে উদ্দীপকের সাদৃশ্য রযেছে? –ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. "উদ্দীপক ও 'সোনার তরী' কবিতায় বর্ষার অনিন্দ্য সুন্দর রূপটি উদ্ভাসিত হয়েছে।" –বিচার করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. গ ৩. গ ৪. খ ৫. গ ৬. গ ৭. ক ৮. ক

সাম্যবাদী

কাজী নজরুল ইসলাম

কবি-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৫ মে (বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম দুখু মিয়া। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। নজরুল অল্প বয়সেই পিতামাতা দুজনকেই হারান। শৈশব থেকেই দারিদ্র্য আর দুঃখ-কষ্ট ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। স্কুলের ধরাবাঁধা জীবনে কখনোই তিনি আকৃষ্ট হননি। বারো বছর বয়সে তিনি লেটো গানের দলে যোগ দেন ও পালাগান লেখেন। পরে বর্ধমানে ও ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার দরিরামপুর হাইস্কুলে লেখাপড়া করেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ১৯১৭ সালে ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে করাচি যান। যুদ্ধশেষে নজরুল কলকাতায় ফিরে আসেন ও সাহিত্যসাধনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি কিছুদিন মসজিদে ইমামতিও করেন। *সাপ্তাহিক বিজলি* পত্রিকায় 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পর সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত হন। তাঁর লেখায় তিনি বিদেশি শাসক, সামাজিক অবিচার ও অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নজরুল সাহিত্য রচনা ছাড়াও কয়েক হাজার গানের রচয়িতা। তিনি বেশ কয়েকটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। তিনি গজল, খেয়াল ও রাগপ্রধান গান রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। আরবি-ফারসি শব্দের সার্থক ব্যবহার তাঁর কবিতাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের তৈরি করা পথে না চলে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে নিজেকে বিকশিত করেছেন। সাহিত্যে এনেছেন সাম্যবাদ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা। গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ রচনায়ও তিনি কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। সম্পাদক এবং সমালোচক হিসেবেও নজরুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি মূলত যৌবনের কবি। যৌবনের ধর্মই হল একদিকে যেমন বিদ্রোহ এবং প্রতিবাদ, অন্যদিকে প্রেম। এ দুটো অনুভূতিরই সূচনা হয় আবেগের প্রাবল্য থেকে। নজরুলের ভাষণ, সম্পাদকীয়, সমালোচনা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রতিটি ক্ষেত্রই ভাষার কাব্যিক ব্যঞ্জনা এবং বলিষ্ঠতায় পূর্ণ। তিনি দৈনিক *নবযুগ*, *ধূমকেতু* ও *লাঙল* পত্রিকায় সম্পাদকের কাজ করেছেন। মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ১৯৭২ সালে কবিকে ঢাকায় আনা হয় এবং তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করে জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। কবিকে ঢাকা ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ডিলিট, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক', ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ' ও বাংলাদেশ সরকার 'একুশে পদক' প্রদান করে। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।

নজরুলের প্রধান সাহিত্যকর্ম :

কাব্যগ্রন্থ : *অগ্নিবীণা* (১৯২২), *বিষের বাঁশী* (১৯২৪), *ছায়ানট (১৯২৪)*, *সাম্যবাদী* (১৯২৫), *সর্বহারা* (১৯২৬), *সিন্ধু-হিন্দোল* (১৯২৭), *চক্রবাক* (১৯২৯), *ফণি-মনসা* (১৯২৯), *প্রলয়-শিখা* (১৯৩০);

উপন্যাস : *বাঁধনহারা* (১৯২৭), *মৃত্যুক্ষুধা* (১৯৩০), *কুহেলিকা* (১৯৩১);

গল্পগ্রন্থ : *ব্যথার দান* (১৯২২), *রিক্তের বেদন* (১৯২৫), *শিউলিমালা* (১৯৩১);

প্রবন্ধগ্রন্থ : *যুগবাণী* (১৯২২), *রাজবন্দীর জবানবন্দী* (১৯২৩), *দুর্দিনের যাত্রী* (১৯২৬), *রুদ্রমঙ্গল* (১৯২৬)।

ভূমিকা

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত সাম্যবাদী কবিতাটি আবদুল কাদির সম্পাদিত বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'নজরুল রচনাবলি'র প্রথম খণ্ড থেকে সংকলিত হয়েছে। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সাম্যবাদী' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত এ কবিতাটি বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক মানব সমাজ গঠনের প্রত্যাশায় রচিত হয়েছে। ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীর দোহাই দিয়ে মানুষে মানুষে বিভেদকে ভুলে কবি মানবতার মর্মবাণীকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আহ্বান জানিয়েছেন এই কবিতায়।

উদ্দেশ্য

কাজী নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী' কবিতাটি পড়ার পর আপনি–

- নজরুল ইসলামের জীবনদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- 'সাম্যবাদ' শব্দটির অর্থের ব্যাপকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কবি মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে কীভাবে মন্দির, মসজিদ, গীর্জার তুলনা করেছেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- এ কবিতা অবলম্বনে নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনা কীভাবে আমাদের জীবনপথের প্রেরণা হতে পারে তা আলোচনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

গাহি সাম্যের গান–
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ক্রিশ্চান।
গাহি সাম্যের গান!
কে তুমি?– পার্সি? জৈন? ইহুদি? সাঁওতাল, ভীল, গারো?
কন্‌ফুসিয়াস্? চার্বাক– চেলা? বলে যাও, বল আরও!
বন্ধু, যা খুশি হও,
পেটে-পিঠে, কাঁধে-মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক–
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থ-সাহেব পড়ে যাও যত সখ,–
কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?
দোকানে কেন এ দর-কষাকষি?– পথে ফোটে তাজা ফুল!
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ!
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।
কেন খুঁজে ফের দেবতা-ঠাকুর মৃত-পুথি-কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে!
বন্ধু, বলিনি ঝুট,
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন,
মস্‌জিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
এই রণ-ভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,
এই মাঠে হলো মেষের রাখাল নবিরা খোদার মিতা।
এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি

ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি।
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান,
এইখানে বসি গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান!
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই।

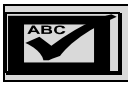

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

আরব-দুলাল– আরব সন্তান। এখানে হযরত মুহম্মদ (স) কে বোঝানো হয়েছে। **ইহুদি–** প্রাচীন হিব্রু বা জু-জাতি ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ। **কনফুসিয়াস–** চিন দেশের একজন প্রখ্যাত দার্শনিক। এখানে তাঁর অনুসারীদের বোঝানো হয়েছে। **কন্দরে**-পর্বতের গুহা, হৃদয়ের গভীর গোপন স্থান। **কোরানের সাম্য-গান–** পবিত্র কোরানের সাম্যের বাণী। **কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, গয়া–** হিন্দুদের পবিত্র ধর্মীয় কয়েকটি স্থান। **গারো–** গারো পর্বত অঞ্চলের অধিবাসী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীবিশেষ। **চার্বাক–** একজন বস্তুবাদী দার্শনিক ও মুনি। তিনি বেদ, আত্মা, পরলোক ইত্যাদিতে আস্থাশীল ছিলেন। **জেরুজালেম–** বায়তুল-মোকাদ্দস। ফিলিস্তিনে অবস্থিত এই স্থানটি মুসলমান, খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের নিকট সমভাবে পুণ্যস্থান। **জেন্দাবেস্তা–** পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা এবং তার ভাষা জেন্দা। **জৈন–** জিন বা মহাবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতাবলম্বী সম্প্রদায়। **ঝুট–** মিথ্যা। **দেউল–** দেবালয়, মন্দির। **নীলাচল–** জগন্নাথক্ষেত্র, নীলবর্ণযুক্ত পাহাড়। যে বিশাল পাহাড়ের পরিসীমা নির্ধারণ করা যায় না। **পার্সি–** পারস্যদেশের বা ইরানের নাগরিক। **বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা–** হিন্দুধর্মের অবতার শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণীই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। **মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়–** মানুষের হৃদয়ই মসজিদ, মন্দিও, গির্জা বা অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রের মতো পবিত্র। **যুগাবতার–** বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ মহাপুরুষ। **শাক্যমুনি–** শাকবংশে জন্ম যার, বুদ্ধদেব। **সাম্য–** সমদর্শিতা, সমতা। **সাম্যবাদ–** জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল মানুষের সমান অধিকার থাকা উচিত এই মতবাদ। **সাঁওতাল, ভীল–** ভারতীয় উপমহাদেশের আদিম নৃগোষ্ঠীবিশেষ। **সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ দেখ নিজ প্রাণ–** ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরান শরিফ, হিন্দুদের বেদ, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বাইবেল– এভাবে পৃথিবীর নানাজাতির নানা ধর্মগ্রন্থ। কবি এখানে বলতে চেয়েছেন সকল ধর্মগ্রন্থের মূলমন্ত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যেই সংকলিত আছে তা হচ্ছে মানবতাবোধ, সমতার দৃষ্টিভঙ্গি। **হিয়া–** হৃদয়।

সারসংক্ষেপ

এই কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। কবির বিশ্বাস মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে পরিচিত হয়ে ওঠা সবচেয়ে সম্মানের। নজরুলের এ আদর্শ আজও প্রতিটি মানুষের জীবনপথের প্রেরণা। কিন্তু মানুষ সম্প্রদায়কে ব্যবহার করে রাজনীতি করে, দুর্বলকে শোষণ করে, এখনও একের বিরুদ্ধে অন্যকে উস্কে দেয়। এক জনের প্রতি অন্য জনকে বিমুখ করার ষড়যন্ত্র করে। নজরুল এ কবিতায় বলেছেন– "মানুষেরই মাঝে স্বর্গনরক মানুষেতে সুরাসুর।" নজরুল জোর দেন অন্তর ধর্মের ওপর। ধর্মগ্রন্থ পড়ে অর্জিত জ্ঞান যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে প্রয়োজন মানবিকতাবোধ। কবি বলেছেন মানুষের হৃদয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন মন্দির কাবা নেই। কবি সকল মত, সকল পথের উপরে স্থান দিয়েছেন মানবিকতা। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলিম সকলকে একই মায়ের সন্তানের মতো ভেবেছেন। নজরুল মানবিক মেলবন্ধনের জন্য সংগীত রচনা করেছেন। বাণী ও সুরের মাধ্যমে মানবতার সুবাস ছড়ানোর চেষ্টা করেছেন। নজরুল 'সাম্যবাদী' কবিতায় মন্দির, মসজিদ, গির্জা বা অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রের মতো পবিত্র মনে করেছেন মানুষের হৃদয়কে। এ হৃদয় যদি পবিত্র থাকে, হৃদয়ে যদি কারো প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ না থাকে, সকলের প্রতি সমদর্শিতা থাকে তাহলে পৃথিবী হবে সুখের আবাসস্থল। সাম্যবাদ মানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ বির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল মানুষের সমান অধিকার থাকা উচিত এ মতবাদ। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'সাম্যবাদী' কবিতায় সব ধরনের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সাম্যবাদের বাণী প্রচার করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১.'কনফুসিয়াস' কে?

ক. চিনা দার্শনিক
খ. হিব্রু কবি
গ. ভারতীয় কবি
ঘ. ইরানি দার্শনিক

২. 'খোদার মিতা' বলতে বোঝানো হয়েছে–

ক. ঈশ্বরের সহচর
খ. খোদার সহচর
গ. আল্লাহর বন্ধু
গ. যিশুর অনুসারী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

যখন তুমি ভবে এলে
তখন তুমি কি জাত ছিলে
কি জাত হবে যাবার কালে
সেই কথা কেন বল না।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে আপনার পঠিত কোন কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে–

ক. লোক-লোকান্তর
খ. সাম্যবাদী
গ. সোনার তরী
গ. ঐকতান

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

শুনহে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

৪. উদ্দীপক ও 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি সবার উপরে স্থান দিয়েছেন–

ক. ধর্মকে
খ. সাম্যবাদকে
গ. মানুষকে
ঘ. প্রশান্তিকে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. মথুরা কাদের পবিত্র ধর্মীয় স্থান?

ক. হিন্দু
খ. মুসলমান
গ. বৌদ্ধ
ঘ. খ্রিষ্টান

৬. কাশী-মথুরা-বৃন্দাবন-গয়া বলতে বোঝানো হয়েছে ?

ক. পর্বতের গুহা
খ. ঐতিহাসিক স্থান
গ. ধর্মীয় স্থান
ঘ. মানুষের হৃদয়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মুহম্মদ কবির নিজের এলাকায় একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত হিসাবে পরিচিত। তিনি এলাকার হিন্দু-মুসলিমকে সমান চোখে দেখেন। তার কাছে সকল ধর্মের মানুষ ন্যায়বিচার পেয়ে থাকে।

৭.'সাম্যবাদী' কবিতার কোন ভাবটি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে?

i. অসাম্প্রদায়িক চেতনা
ii. সাম্প্রদায়িক চেতনা
iii. সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. ii ও iii

৮. মুহম্মদ কবির ও 'সাম্যবাদী' কবিতায় কাজী নজরুল ইসলামের উপজীব্য–

i. মনুষ্যত্ববোধ
ii. ধর্মীয় মাহাত্ম্য
iii. বংশ পরিচয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ
কাণ্ডারি ! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ।
হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারি ! বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার !

ক. 'চার্বাক' কে?
খ. কবি 'সাম্যের গান' গেয়েছেন কেন?
গ. উদ্দীপকে 'সাম্যবাদী' কবিতার কোন দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'সাম্যবাদী' কবিতার চেতনাকে ধারণ করেছে।" –উক্তিটি মূল্যায়ন করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক.

চার্বাক একজন মুনি ও বস্তুবাদী দার্শনিক।

খ.

সাম্যবাদ বলতে কবি রাষ্ট্রের সকল নাগরিক অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকার ভোগ করাকে বুঝিয়েছেন।

'সাম্য' শব্দের অর্থ সমতা। এটি একটি রাজনৈতিক পরিভাষা। একটি রাষ্ট্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ধনী-দরিদ্র সকল নাগরিক একই রকম অধিকার ভোগ করে। রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে সবার সমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এর যদি কোন ব্যত্যয় ঘটে তবে সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাম্যবাদের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ধর্মের অচলায়তন ভেঙ্গে একটি আদর্শ মানবসমাজ গঠনে সকলকে উজ্জীবিত করেছেন।

গ.

উদ্দীপকে 'সাম্যবাদী' কবিতার অসাম্প্রদায়িক চেতনার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। কবি সাম্যের গান গেয়ে মানবসমাজকে জোটবদ্ধ করতে চেয়েছেন। তাঁর সাম্যের সমাজে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কোনো পার্থক্য থাকবে না। সবকিছু ছাপিয়ে মানুষের 'মানুষ' পরিচয়টিই বড় হয়ে উঠবে।

উদ্দীপকের কবিতায় অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। এখানে অসহায় জাতি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে ডুবন্ত প্রায়। এ অসহায় জাতিকে উদ্ধার করা কাণ্ডারির দায়িত্ব। এরা হিন্দু না মুসলিম এটা কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। এরা মানুষ, এটিই বিবেচ্য বিষয়। বস্তুত উদ্দীপকে কবির একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ জাগ্রত করার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। 'সাম্যবাদী' কবিতায়ও কবি কাজী নজরুল ইসলাম মানবতাবাদী। তিনি এই কবিতায় সাম্যের গান গেয়ে গোটা মানবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে আগ্রহী। তাঁর স্বপ্নের সমাজে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমঅধিকার নিশ্চিত হবে। এ সমাজে হিন্দু,

মুসলিম, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি ভেদাভেদ থাকবে না। অতএব, বলা যায় উদ্দীপকে 'সাম্যবাদী' কবিতার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ.

উদ্দীপকের বিষয়বস্ত 'সাম্যবাদী' কবিতার চেতনাকে ধারণ করেছে– মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মননে মানবতাবাদী চেতনাকে লালন করেছেন। মানবধর্মকে তিনি জাতিধর্মের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। কবি ধর্মীয় ভেদ ভুলে হিন্দু, খ্রিষ্টান, মুসলিম, বৌদ্ধদের মধ্যে সাম্যের কথা বলেছেন। কবি আশা করেছেন- সমাজে মানুষে মানুষে সব ব্যবধান ঘুচে গিয়ে সংকীর্ণবাদীদের পতন ঘটবে। তিনি কবিতাটিতে ধর্মের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে পৃথিবীতে সাম্যের সমাজ গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মানবতার গান গেয়েছেন। তাঁর চেতনায় মানবতাবাদী বোধ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ কবিতার মূলসুর শ্রেণিহীন মানবতাবাদী সমাজ গড়ার প্রত্যয়। কবি এই মানবতার গান গেয়ে গোটা মানবসমাজকে একসঙ্গে সংযুক্ত করতে চেয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার চেয়ে সুন্দর পৃথিবীতে আর কিছু হতে পারে না। বস্তুত মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবধান ঘুচিয়ে শান্তির বার্তা ঘোষণা করা হয়েছে 'সাম্যবাদী' কবিতায়। উদ্দীপকের কবিতায়ও কবির মানবতাবাদী চেতনার আদর্শ ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকের কবিতাংশে কাণ্ডারি জাতির কর্ণধার। তার কাঁধে অসহায় জাতিকে উদ্ধারের গুরুভার। এ কাজে মানুষের ধর্ম ও বর্ণ পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানুষের মানুষ পরিচয়টিই কাণ্ডারির কাছে বড় হবে। মূলত 'সাম্যবাদী' কবিতার মানব চেতনাই উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম আজন্ম অসাম্প্রদায়িক মানব চেতনাকে লালন করেছেন। এটিকেই তিনি 'সাম্যবাদী' কবিতায় ভাবে ও ভাষায় তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় সাম্যের গান গেয়ে মানব সমাজকে এক করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তিনি কল্পনা করেছেন আমাদের সমাজে এক উদার মানবতাবাদী পবিত্র আত্মার উদ্বোধন ঘটবে। 'সাম্যবাদী' কবিতার মতো উদ্দীপকেরও অন্বিষ্ট কাণ্ডারির কাছে মানুষের বড় পরিচয় হবে 'মানুষ'। যেখানে হিন্দু-মুসলিম কোনো বিভেদ থাকবে না। এক মানবতাবাদী জীবনবোধ জাতির কর্ণধারকে জীবনপথে প্রেরণা যোগাবে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'সাম্যবাদী' কবিতার চেতনাকে ধারণ করেছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

মুসলমান এবং জেলেপাড়ার অমুসলিম অধিবাসীরা এভাবেই দিন কাটায়। ধর্ম যতই পৃথক হোক, দিনযাপনের মধ্যে তাহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। সকলেই তাহারা ধর্মের চেয়ে এক বড় অধর্ম পালন করে দারিদ্র্য। বিবাদ যদি কখনো বাধে, সে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিবাদ, মিটিয়াও যায় অল্পেই। কুবেরের সঙ্গে সিধুর যে কারণে বিবাদ হয়, আমিনুদ্দিনের সঙ্গে জহরের সে কারণে বিবাদ হয়, কুবেরের-আমিনুদ্দিনের বিবাদও হয় সেই কারণেই।

ক. আরব-দুলাল কে?

খ. কবি 'অন্তর-ধর্মে'র উপর জোর দিয়েছেন কেন?

গ. উদ্দীপকের অসাম্প্রদায়িক চেতনা 'সাম্যবাদী' কবিতার সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'সাম্যবাদী' কবিতায় ধর্মের চেয়ে মানুষের মনুষ্যত্ববোধটিই বড় হয়ে উঠেছে।" –বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. গ ৩. খ ৪. গ ৫. ক ৬. গ ৭. ক ৮. ক

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে

জীবনানন্দ দাশ

কবি-পরিচিতি

জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সত্যানন্দ দাশ ছিলেন বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। মা কুসুমকুমারী দাশও একজন কবি ছিলেন এবং তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে'– এখনো জনপ্রিয় শিশুপাঠ্য। জীবনানন্দ দাশ ১৯১৫ সালে বরিশাল ব্রজমোহন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯১৭ সালে ব্রজমোহন কলেজ থেকে আইএ, ১৯১৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স ও ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি কলকাতা সিটি কলেজ ও বরিশাল ব্রজমোহন কলেজসহ বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের কিছু পূর্বে সপরিবারে বাংলাদেশ ত্যাগ করে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। জীবননান্দ দাশ বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান আধুনিক কবি এবং বাংলা কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃতদের মধ্যে অন্যতম। তাঁকে বাংলা ভাষার 'শুদ্ধতম কবি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বুদ্ধদেব বসু তাঁকে 'নির্জনতম কবি' বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাংলার প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যে কবি নিমগ্নচিত্ত। এ দেশের গাছপালা, লতাগুল্ম, ফুল-পাখি তাঁর আজন্ম প্রিয়। তাঁর নিসর্গবিষয়ক কবিতা ১৯৭১-পূর্ব আন্দোলনে ও আমাদের মুক্তিযুদ্ধে এদেশের মানুষকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। তিনি নিভৃতে ১৪টি উপন্যাস ও ১০৮টি ছোটগল্প রচনা করেছেন, যার একটিও জীবদ্দশায় প্রকাশ করেননি। এছাড়া তিনি আটশরও বেশি কবিতা লিখলেও জীবদ্দশায় মাত্র ২৬২টি কবিতা প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ অক্টোবর জীবনানন্দ দাশ কলকাতায় এক ট্রাম-দুর্ঘটনায় আহত হন এবং ২২ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কাব্যগ্রন্থ : *ঝরা পালক* (১৯২৮), *ধূসর পাণ্ডুলিপি* (১৯৩৬), *বনলতা সেন* (১৯৪২), *মহাপৃথিবী* (১৯৪৪), *সাতটি তারার তিমির* (১৯৪৮), *রূপসী বাংলা* (১৯৫৭), *বেলা অবেলা কালবেলা* (১৯৬১);

উপন্যাস : *মাল্যবান* (১৯৭৩), *সুতীর্থ* (১৯৭৪);

প্রবন্ধগ্রন্থ : *কবিতার কথা* (১৯৫৬)।

ভূমিকা

জীবনানন্দ দাশ রচিত 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতাটি *রূপসী বাংলা* নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। অপরূপ রূপে রূপসী প্রকৃতির সৌন্দর্যের এমন লীলাভূমি পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই এমন ধারণা করেই তিনি বাংলার রূপের বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতির রহস্যময় সৌন্দর্যই কবির কবিতার মূল প্রেরণা।

উদ্দেশ্য

জীবনানন্দ দাশের 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতাটি পড়ার পর আপনি–

- রূপসী বাংলার সৌন্দর্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকা গাছ-গাছালি, নদী, ফুল-ফল ও পাখিদের অপূর্ব রূপ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- প্রকৃতির রূপ দেখে কবি কীভাবে তাকে রূপসী নারীর সঙ্গে তুলনা করেছেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে– সবচেয়ে সুন্দর করুণ:
সেখানে সবুজ ডাঙা ভ'রে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল;
সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল;
সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ;
সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে– সেখানে বরুণ
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল;
সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল,
সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ;
সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর;
সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে;
সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর–
শঙ্খমালা নাম তার : এ বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে
তারে আর খুঁজে তুমি পাবে নাকো– বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর,
তাই-সে-জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অরুণ– সূর্য। **এই পৃথিবীতে...সুন্দর করুণ–** কবির চোখে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, মমতারসে সিক্ত, সহানুভূতিতে আর্দ্র ও বিষণ্ন দেশ বাংলাদেশ। **বর–** এখানে আশীর্বাদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। **বারুণী–** জলের দেবী বরুণানী, বরুণের স্ত্রী, জলের দেবী। **বিরল–** কম। **বিশালাক্ষী–** যে রমণীর চোখ আয়ত বা টানাটানা। আয়তলোচনা সুন্দরী নারী। **নাটা–** লতাকরঞ্চ; গোলাকার ক্ষুদ্র ফল বা তার বীজ। **সেখানে ভোরের...জাগিছে অরুণ–** বাংলার প্রভাতের সৌন্দর্য ও রহস্যময়তা আঁকতে গিয়ে ভোরে মেঘের আড়াল থেকে গাঢ় লাল সূর্যের আলো বিচ্ছুরণ যেন ধারণ করেছে করমচা বা করমচা ফুলের রং। **সেখানে বারুণী থাকে...অবিরল জল–** জলে পরিপূর্ণ এদেশের অসংখ্য নদী-নালার স্রোতধারার প্রাণৈশ্বর্য ও সৌন্দর্যের রূপ আঁকা হয়েছে এই পঙ্‌ক্তি দুটির মধ্যে। **সেইখানে শঙ্খচিল...,–** বাংলাদেশে প্রাণী আর প্রকৃতির ঐক্য ও সংহতিতে একাকার। পানের বনে হাওয়ায় যে চঞ্চলতা জেগে ওঠে সেই চঞ্চলতা সম্প্রসারিত হয় দূর আকাশের শঙ্খচিলে। **সুদর্শন–** এক ধরনের পোকা।

সারসংক্ষেপ

সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা এই বাংলাদেশ কবির চোখে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব লীলাভূমি সারা পৃথিবীর মধ্যে অনন্য। অসংখ্য বৃক্ষ, গুল্ম ছড়িয়ে আছে এদেশের জনপদে অরণ্যে। তাদের মধ্যে মধুকূপী, কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল অন্যতম। বাংলার প্রভাতের সৌন্দর্য ও রহস্যময়তা যেন মেঘের আড়াল থেকে গাঢ় লাল সূর্যের আলো ধারণ করেছে করমচা বা করমচা ফুলের রং। হাওয়া যখন পানের বনে চঞ্চলতা জাগায় তখন দূর আকাশের শঙ্খচিল যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। এদেশের প্রতিটি নদ-নদী স্বচ্ছতোয়া জলে পূর্ণ থাকে। জলের দেবতা অনিঃশেষ জলধারা দিয়ে স্রোতস্বিনী রাখে এদেশের অসংখ্য নদীকে। প্রকৃতি আর প্রাণিকুলের বন্ধনে গড়ে উঠেছে চির অবিচ্ছেদ্য এক সংহতি। হাওয়া পানের বনে চঞ্চলতা জাগালে দূর আকাশের শঙ্খচিল চঞ্চল হয়ে ওঠে। ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট লক্ষ্মী পেঁচাও মিলে থাকে প্রকৃতির গভীরে, অন্ধকারের বিচিত্ররূপ এই দেশে। অন্ধকার ঘাসের উপর নুয়ে থাকে লেবুর শাখা কিংবা অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে সুদর্শন উড়ে যায়। শঙ্খমালা নামের রূপসী নারীর হলুদ শাড়ির

বর্ণশোভা জন্ম দেয়। কবির ধারণা, পৃথিবীর অন্য কোথাও শঙ্খমালাদের পাওয়া যাবে না। তাঁর বিশ্বাস, বিশালাক্ষী বর দিয়েছিল বলেই নীল-সবুজে মেশা বাংলার ভূ-প্রকৃতির মধ্যে এই অনুপম সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মধুকূপী কী?

ক. ঘাস　　খ. পান
গ. লতা　　ঘ. বৃক্ষ

২. 'সবুজ ডাঙ্গা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. সবুজ প্রকৃতি　　খ. সবুজ রং
গ. বাংলার প্রকৃতি　　ঘ. সূর্যের রং

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।

৩. উদ্দীপকে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার কোন দিকটি প্রকাশিত হয়েছে?

ক. মর্ত্যপ্রীতি　　খ. প্রাকৃতিক সৌন্দর্য
গ. প্রকৃতির রহস্যময়তা　　ঘ. সৌন্দর্য ভাবনা

৪. উদ্দীপক ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার উপজীব্য হচ্ছে–

i. দেশপ্রেম
ii. প্রকৃতিপ্রেম
iii. সম্প্রীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. i ও ii　　ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'বনলতা সেন' কোন ধরনের রচনা?

ক. কাব্য　　খ. প্রবন্ধ
গ. গল্প　　ঘ. উপন্যাস

৬. 'হলুদ শাড়ি' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

ক. কাঁচা ধানের মৌসুম　　খ. পাকা ধানের মৌসুম
গ. বাংলার পোশাক বৈচিত্র্য　　ঘ. বাংলার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

রূপসী বাংলার রূপের যেন শেষ নেই। বাংলার প্রকৃতির এই রূপ এবং সৌন্দর্য পৃথিবীর অন্য কোথাও খুব একটা দেখা যায় না।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার কোন চরণের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. সেখানে সবুজ ডাঙ্গা ভরে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল।
খ. কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল।
গ. তারে আর খুঁজে তুমি পাবে নাকো-বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর।
ঘ. সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে-

৮. উদ্দীপক ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় ফুটে উঠেছে–

i. বাংলার রূপ
ii. প্রাকৃতিক সৌন্দর্য
iii. প্রকৃতির সংহতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়- হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে,
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়।

ক. জীবনানন্দ দাশ কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
খ. সুদর্শন কেন উড়ে যায়?
গ. উদ্দীপকের কোন দিকটি 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার সঙ্গে তুলনীয়? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপক ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় স্বদেশপ্রেমই প্রাধান্য পেয়েছে।" –মন্তব্যটি পর্যালোচনা করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক.

কবি জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ সালে বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন।

খ.

কবির কল্পনায় সুদর্শন বাংলার রূপ ফুটিয়ে তুলতে উড়ে বেড়ায়।

সুদর্শন হল এক ধরনের গোবরে পোকা। এর বসবাস গোবরের ঢিবিতে। সুদর্শন সন্ধ্যার অন্ধকারে সিক্ত বাতাসে তার ঘরে ফিরে। কবি জীবনানন্দের মতে বাংলার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান একীভূত হয়েছে। এর মধ্যে সুদর্শন পোকাও বাংলার রূপ-সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করে। কবির ধারণা এদেশকে মন মাতানো সৌন্দর্যের দেশ হিসাবে ফুটিয়ে তুলতে সুদর্শন পোকা উড়ে বেড়ায়।

গ.

উদ্দীপকের প্রকৃতিপ্রেমের বিষয়টি 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার সঙ্গে তুলনীয়।

বাংলার প্রকৃতি অপূর্ব সৌন্দর্যের লীলাভূমি। এখানে চারদিকে শুধু সবুজের সমারোহ। এদেশের নদ-নদী একদিকে যেমন প্রকৃতিকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে, তেমনি অন্যদিকে তা দেশকে সমৃদ্ধ করেছে। এদেশের সবুজ প্রকৃতি, ভোরের দোয়েল, পল্লবের স্তূপ, জাম, বট, কাঁঠাল, হিজলের গাছ প্রভৃতি যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে তা চিরায়ত মানব হৃদয়কে স্পর্শ করে।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় প্রকৃতিপ্রেমের বিষয়টি উঠে এসেছে। কবিতায় কবির কাছে তাঁর জন্মভূমি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সুন্দর মনে হয়েছে। এদেশের রূপ ও সৌন্দর্যে কবি এতটাই মুগ্ধ যে তিনি পৃথিবীর আর কোনো দেশের সৌন্দর্য উপভোগ করতে আগ্রহী নন। দেশের সবুজ প্রকৃতি, ডুমুর গাছের সৌন্দর্য কবির হৃদয়ে এনেছে প্রশান্তির ছোঁয়া। দেশের সৌন্দর্যের প্রতি এমন মুগ্ধতা মূলত কবির প্রকৃতিপ্রেমেরই ইঙ্গিত বহন করে। উদ্দীপকের কবিও বাংলার প্রকৃতিকে ভালোবেসেছেন। কবি তাঁর মাতৃভূমির প্রকৃতিতে এতটাই মগ্ন যে মৃত্যুর পরও বারবার এদেশের বুকে ফিরে আসতে চেয়েছেন। এদেশের প্রকৃতির মাঝে তিনি খুঁজে পেয়েছেন শান্তির ছায়া। তিনি মানুষরূপে না হলেও শঙ্খচিল,

শালিক কিংবা ভোরের কাকের রূপ ধরে কুয়াশার বুকে ভেসে কাঁঠাল-ছায়ায় কার্তিকের নবান্নের দেশে ফিরে আসতে চান। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের প্রকৃতিপ্রেমের বিষয়টি 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

ঘ.

বাংলার প্রকৃতি উদ্দীপক ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় প্রধান রূপে ফুটে উঠেছে।

বাংলার প্রাকৃতিক রূপ অপরূপ মহিমায় মহিমান্বিত। এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি পৃথিবীতে কমই আছে। এদেশের সৌন্দর্যকে আরো বেশি আকর্ষণীয় করেছে জালের মত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য নদ-নদী। এছাড়া এদেশের প্রকৃতি প্রত্যেক ঋতুতে সজ্জিত হয় নানা রূপে। আর পরিবর্তন হয় বাংলার নদী, মাঠ, ঘাটের চিত্র ও বাঙালির হৃদয়।

উদ্দীপকে বাংলার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ফুটে উঠেছে। কবি এদেশের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বারবার এই কার্তিকের নবান্নের দেশে কুয়াশার বুকে ভেসে ফিরে আসতে চেয়েছেন। উদ্দীপকের উপমায় উঠে এসেছে বাংলার প্রতি মুগ্ধতা। শঙ্খচিল, শালিক, ভোরের কাক ইত্যাদিতেও কবির স্বদেশপ্রেমের চিত্র ধরা পড়েছে। অন্যদিকে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায়ও কবির স্বদেশপ্রীতির পরিচয় লক্ষ করা যায়। এদেশের প্রকৃতির মাঝে কবি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছেন। এদেশের চারদিকে সবুজের সমারোহ, পূর্বাকাশের সূর্য, নদ-নদী সবকিছু কবির হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ তুলেছে। বস্তুত কবিতাটিতে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বন্দনার মধ্য দিয়ে স্বদেশপ্রীতি ফুটে উঠেছে।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কবির বাংলার প্রতি মমত্ববোধ প্রকৃতি বর্ণনার আবহে উপস্থাপিত হয়েছে। কবির চোখে এদেশের সবুজ স্থলভাগ মধুকূপী ঘাসে ঢেকে আছে নরোম স্নিগ্ধতায়, সেখানে আছে কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজলের শ্যামল ছায়া, সেখানে ছড়িয়ে আছে ভোরের মেঘে ঢাকা সূর্যের নাটা রঙ অপার মুগ্ধতায়। কবির কাছে মনে হয়েছে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, মমতারসে সিক্ত, সহানুভূতিতে আর্দ্র বাংলাদেশ। বস্তুত কবিতার এ জন্মভূমি প্রীতির চিত্রণের বিষয়টিই উদ্দীপককে অনুরণিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপক ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় স্বদেশপ্রেমই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা;
তাহার মাঝে আছে দেশ এক- সকল দেশের সেরা;
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;
এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায এমন ধূম্র পাহাড়;
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।

ক. শঙ্খচিলের বৈশিষ্ট্য কী?

খ. কবির চোখে এদেশ সবচেয়ে সুন্দর কেন?

গ. উদ্দীপকের কবির 'দেশ' 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কাকে প্রতিনিধিত্ব করে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় প্রকৃতিপ্রেম উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে।" –স্বীকার করেন কি? যুক্তিসহ আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. ক ৩. খ ৪. গ ৫. ক ৬. গ ৭. ক ৮. ক

কবর

জসীমউদ্‌দীন

কবি-পরিচিতি

জসীমউদ্‌দীন ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ফরিদপুরের গোবিন্দপুর গ্রাম। তাঁর পিতা আনসারউদ্দিন মোল্লা ও মা আমিনা খাতুন। ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আইএ ও বিএ পাস করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ পাস করেন। পাস করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে রামতনু লাহিড়ী গবেষণা সহকারী পদে যোগ দেন। এরপর ১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং পরে সরকারি তথ্য ও প্রচার বিভাগে উচ্চপদে যোগদান করেন। কলেজে পড়ার সময় তিনি রচনা করেন বিখ্যাত 'কবর' কবিতা এবং এই কবিতা তাঁর ছাত্রজীবনেই ম্যাট্রিক পরীক্ষার বাংলা পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় বাংলার মাঠ, ঘাট, নদী-নালা, বালুচর, চাষীর কুটির, ফুল-পাখি, গ্রামের সাধারণ মানুষ ও তাদের সুখ দুঃখের চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সেজন্য তাঁকে বলা হয় 'পল্লিকবি'। তাঁর বিখ্যাত *নক্সী কাঁথার মাঠ* কাব্যটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি গান, নাটক ও গদ্যরচনাতেও অবদান রেখেছেন। ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিলিট উপাধি প্রদান করে। এছাড়া সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৭৬ সালের ১৪ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কাব্যগ্রন্থ : *রাখালী* (১৯২৭), *নক্সী কাঁথার মাঠ* (১৯২৯), *বালুচর* (১৯৩০), *ধানখেত* (১৯৩৩), *সোজন বাদিয়ার ঘাট* (১৯৩৪), *এক পয়সার বাঁশী* (১৯৫৬), *মাটির কান্না* (১৯৫৮);

গানের সংকলন : *রঙিলা নায়ের মাঝি* (১৯৩৫), *গাঙের পাড়* (১৯৬৪);

নাটক : *পদ্মাপাড়* (১৯৫০), *বেদের মেয়ে* (১৯৫১), *পল্লীবধূ* (১৯৫৬), *গ্রামের মায়া* (১৯৫৯);

উপন্যাস : *বোবাকাহিনী* (১৯৬৪);

গদ্যরচনা : *চলে মুসাফির* (১৯৫২), *বাঙালির হাসির গল্প* (১৯৬০), *জীবন কথা* (১৯৬৪), *হলদে পরির দেশে* (১৯৬৭), *জার্মানীর শহরে বন্দরে* (১৯৭৫)।

ভূমিকা

জসীমউদ্‌দীনের *রাখালী* কাব্যগ্রন্থ থেকে 'কবর' কবিতাটি সংকলিত হয়েছে। কবিতাটি ষান্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। কাহিনিধর্মী এই কবিতাটিতে সহজ সরল ভাষায় এক গ্রামীণ বৃদ্ধের জীবনের প্রিয়জন হারানোর বেদনার স্মৃতি বর্ণিত হয়েছে। জীবনের শেষ প্রান্তে বৃদ্ধ যে তাঁর আপনজনদের হারিয়ে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন, তারই বর্ণনা কবি গভীর সহানুভূতি দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতাটি পড়ার পর আপনি–

- কবি জসীমউদদীনের কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- সহজ-সরল কৃষক জীবনের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করবেন।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ার পর আপনি–

- দাদুর বেদনা ও কষ্টের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- দাদুর বর্ণনা থেকে দাদির চরিত্র বুঝতে ও লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।
এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিতে ভেবে হইতাম সারা,
সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা।
সোনালি উষায় সোনামুখ তার আমার নয়নে ভরি
লাঙল লইয়া ক্ষেতে ছুটিতাম গাঁয়ের ও-পথ ধরি।
যাইবার কালে ফিরে ফিরে তারে দেখে লইতাম কত
এ কথা লইয়া ভাবি-সাব মোরে তামাশা করিত শত।
এমনি করিয়া জানি না কখন জীবনের সাথে মিশে
ছোট-খাট তার হাসি ব্যথা মাঝে হারা হয়ে গেনু দিশে।

বাপের বাড়িতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা
"আমারে দেখিতে যাইও কিন্তু উজান-তলীর গাঁ"
শাপলার হাটে তরমুজ বেচি দু পয়সা করি দেড়ী,
পুঁতির মালার একছড়া নিতে কখনও হত না দেরি।
দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া গাঁটে,
সন্ধ্যা বেলায় ছুটে যাইতাম শ্বশুরবাড়ির বাটে!
হেস না– হেস না– শোন দাদু, সেই তামাক মাজন পেয়ে,
দাদি যে তোমার কত খুশি হত দেখিতিস যদি চেয়ে!
নথ নেড়ে নেড়ে কহিত হাসিয়া "এতদিন পরে এলে,
পথ পানে চেয়ে আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখিজলে।"
আমারে ছাড়িয়া এত ব্যথা যার কেমন করিয়া হায়,
কবর দেশেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিঝ্‌ঝুম নিরালায়!
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ্ দাদু, "আয় খোদা! দয়াময়,
আমার দাদির তরেতে যেন গো ভেস্ত নসিব হয়।"

তারপর এই শূন্য জীবনের যত কাটিয়াছি পাড়ি
যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি।
শত কাফনের শত কবরের অঙ্ক হৃদয়ে আঁকি,
গণিয়া গণিয়া ভুল করে গণি সারা দিনরাত জাগি।
এই মোর হাতে কোদাল ধরিয়া কঠিন মাটির তলে,
গাড়িয়া দিয়াছি কত সোনামুখ নাওয়ায়ে চোখের জলে।
মাটিরে আমি যে বড় ভালোবাসি, মাটিতে মিশায়ে বুক,
আয়– আয় দাদু, গলাগলি ধরি কেঁদে যদি হয় সুখ।

এখানে তোর বাপজি ঘুমায়, এইখানে তোর মা,
কাঁদছিস তুই? কী করিব দাদু! পরাণ যে মানে না।
সেই ফাল্গুনে বাপ তোর এসে কহিল আমারে ডাকি,
"বা-জান, আমার শরীর আজিকে কী যে করে থাকি থাকি।"
ঘরের মেঝেতে সপ্‌টি বিছায়ে কহিলাম, বাছা শোও,
সেই শোওয়া তার শেষ শোওয়া হবে তাহা কি জানিত কেউ?
গোরের কাফনে সাজায়ে তাহারে চলিলাম যবে বয়ে,
তুমি যে কহিলা, "বা-জানরে মোর কোথা যাও, দাদু লয়ে?"
তোমার কথায় উত্তর দিতে কথা থেমে গেল মুখে,
সারা দুনিয়ার যত ভাষা আছে কেঁদে ফিরে গেল দুখে!

তোমার বাপের লাঙল জোয়াল দুহাতে জড়ায়ে ধরি,
তোমার মায়ে যে কতই কাঁদিত সারা দিনমান ভরি।
গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনো পথে যেত ঝরে,
ফাল্‌গুনী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত শুনো–মাঠখানি ভরে।
পথ দিয়া যেতে গেঁয়ো পথিকেরা মুছিয়া যাইত চোখ,
চরণে তাদের কাঁদিয়া উঠিত গাছের পাতার শোক।
আথালে দুইটি জোয়ান বলদ সারা মাঠ পানে চাহি,
হাম্বা রবেতে বুক ফাটাইত নয়নের জলে নাহি।
গলাটি তাদের জড়ায়ে ধরিয়া কাঁদিত তোমার মা,
চোখের জলের গহীন সায়রে ডুবায়ে সকল গা।

উদাসিনী সেই পল্লি-বালার নয়নের জল বুঝি,
কবর দেশের আন্ধার ঘরে পথ পেয়েছিল খুঁজি।
তাই জীবনের প্রথম বেলায় ডাকিয়া আনিল সাঁঝ,
হায় অভাগিনী আপনি পরিল মরণ-বিষের তাজ।
মরিবার কালে তোরে কাছে ডেকে কহিল, "বাছারে যাই,
বড় ব্যথা র'ল, দুনিয়াতে তোর মা বলিতে কেহ নাই;

দুলাল আমার, যাদুরে আমার, লক্ষ্মী আমার ওরে,
কত ব্যথা মোর আমি জানি বাছা ছাড়িয়া যাইতে তোরে।"
ফোঁটায় ফোঁটায় দুইটি গণ্ড ভিজায়ে নয়ন-জলে
কী জানি আশিস করে গেল তোরে মরণ–ব্যথার ছলে।

ক্ষণপরে মোরে ডাকিয়া কহিল– "আমার কবর গায়
স্বামীর মাথার মাথালখানিরে ঝুলাইয়া দিও বায়।"
সেই সে মাথাল পচিয়া গলিয়া মিশেছে মাটির সনে,
পরাণের ব্যথা মরে নাক সে যে কেঁদে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
জোড়মানিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরু ছায়,
গাছের শাখারা স্নেহের মায়ায় লুটায়ে পড়েছে গায়।
জোনাকি–মেয়েরা সারারাত জাগি জ্বালাইয়া দেয় আলো
ঝিঁঝিঁরা বাজায় ঘুমের নূপুর কত যেন বেসে ভালো।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ্ দাদু, "রহমান খোদা! আয়;
ভেস্ত নাজেল করিও আজিকে আমার বাপ ও মায়।"

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অভাগিনী– যে মহিলার ভাগ্য খারাপ। **আথালে**– গোহালে (আথাল আঞ্চলিক শব্দ, পল্লিকবিদের রচনায় পাওয়া যায়)। **আন্ধার–** আঁধার। **আশিস–** আশীর্বাদ, দোয়া। **কাফন**– মৃতের পোশাক। **কেয়ামত**– শেষ বিচারের দিন, এখানে মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। **ক্ষণপরে**– একটু পরে। **গহীন–** গভীর সাগর । **গাড়িয়া–** পুঁতে দেয়া। **গাঁটে**– কোমরে। **গেঁয়ো–** গ্রামের। **গন্ড–** গাল। **গোর–** কবর। **ঘুমের নূপুর–** বিশেষ অর্থে শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। শিশুকে ঘুম পাড়ানোর জন্য যে গান গাওয়া হয় তাকে বলে ঘুম পাড়ানী গান। ঝিঁঝি পোকার শব্দকে এখানে ঘুম পাড়ানী বাজনা বলা হয়েছে। যে বাজনা শুনলে হয়তো ঘুম আরও গাঢ় হয়। খুবই কাব্যিক প্রয়োগ হয়েছে শব্দ দুটির। **জোনাকী**– ছোটো পোকা, যার গায়ের আলো রাতে স্পষ্ট দেখা যায়। **ঝিঁঝিঁ–** এক ধরনের পোকা, তাদের ডাকে ঝিঁঝিঁ শব্দ হয়। **তরেতে**– জন্য। **তরু-ছায়**– গাছের ছায়ায়। **দোয়া মাঙ দাদু**– দোয়া চাও দাদু। **দেড়ী**– দেড় সের। **নথ–** নাকের অলঙ্কার, গহনা। **নাজেল**– নেমে আসা। **নাহি–** গোসল করে। **বাপজি**– বাবা, কোথাও কোথাও সম্বোধনের সঙ্গে 'জি' ব্যবহারের চলন আছে। যেমন, বুজি (বুবু+জি=বুজি)। **নূপুর–** পায়ের অলঙ্কার যা রুম ঝুম শব্দ সৃষ্টি করে। **পরাণ–** প্রাণ, এখানে 'মন' অর্থে ব্যবহৃত। **ফাল্গুনী হাওয়া**– ফাল্গুন মাস হলো বসন্ত কাল, সেই সময়ের হাওয়া। **বাটে**– পথে। **বা-জান–** বাবাজান বা বাপজান, 'জান' এখানে আদর ও সম্মান সূচক শব্দ। **ভেস্ত**– বেহেশত। **মরিবার কালে–** মরার সময়। **মাথাল–** খড় বাঁশের পাতা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি ছাতা বিশেষ। গ্রামের কৃষকেরা হাতে তৈরি ছোটো এ ছাতা মাথায় টুপির মতো করে পরে। রোদ বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচায়। এটি আঞ্চলিক শব্দ। **মরণ-বিষের তাজ–** মরণকে এখানে বিষ বলা হয়েছে। তাজ হলো মুকুট, যা মাথায় পরা হয়। মাথায় বিষের মুকুট পরলে তাকে নিশ্চয় মরতে হবে। কবিতায় শব্দ তিনটির ব্যবহারে মৃত্যুর মতো কঠিন সত্যও হয়ে উঠেছে কাব্যময়। **মজীদ**– মসজিদ (আঞ্চলিক শব্দ)। **সপ**– বিশেষ ধরনের লম্বা ও মোটা ঘাস দিয়ে তৈরি মাদুর। **সোনামুখ–** সোনালী ঊষার মতো সুন্দর রঙভরা মুখ বা চেহারা। **সোনালী ঊষা**– সূর্য ওঠার আগে আকাশের পূর্বদিকে যে লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ে তাকেই কবি সোনালি ঊষা বলেছেন। ঊষাকাল হলো সূর্য ওঠার আগের সময়টুকু।

সারসংক্ষেপ

'কবর' কবিতায় বুড়ো দাদু তার জীবনের গল্প শোনাচ্ছেন নাতিকে। বুড়ো তার অতীত সুখের স্মৃতিচারণ করছেন সেই ডালিম গাছের নিচে যেখানে শায়িত আছে তার স্ত্রী। যাকে তিনি পুতুলের মতো লাল টুকটুকে বউ করে ঘরে তুলেছিলেন। যে ঘর-সংসার কিছুই বুঝতো না, পুতুল নিয়ে খেলা করত। পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেলে কেঁদে আকুল হতো। সেই ছোট্ট বউ একসময় স্বামী সংসার বুঝতে শিখল। কোল আলো করে এলো ছেলে-মেয়ে। তখন তিনি বাপের বাড়িতে গিয়েও থাকতে চাইতেন না। বউকে বাপের বাড়ি পাঠালে দাদুও অস্থির হয়ে যেতেন কদিন পরই। হাট থেকে ফেরার পথে পুঁতির মালা, তামাক, মাজন ইত্যাদি ছোটো খাটো জিনিস নিয়ে বউকে দেখে আসতেন। দুচার দিন স্বামীকে না দেখে যে থাকতে পারতো না, সে কেমন করে এখন কবরের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। তাছাড়া শুধু তো একটা মৃত্যু নয়, আরো অনেক আপন জনের মৃত্যু দেখেছেন তিনি। সেই শোক বহন করছেন তিনি তিরিশ বছর ধরে। প্রতিদিনই তিনি হারানো প্রিয়জনদের কথা ভাবেন, কাঁদেন আর দোয়া চান পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে। নাতিকেও দোয়া করতে বলছেন তার দাদির জন্য, তাঁকে যেন আল্লাহ বেহেশতবাসী করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'কবর' কবিতায় বৃদ্ধ দাদু তার নাতিকে কয়টি কবরের বর্ণনা দিয়েছেন?

ক. তিনটি　　খ. চারটি
গ. পাঁচটি　　গ. ছয়টি

২.জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় গ্রামীণ জীবনের আবহ ফুটে উঠেছে–

i. শব্দের ব্যবহারে
ii. উপমার সাহায্যে
iii. চিত্রকল্পের মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

যেতে নাহি দিব হায়
তবু যেতে দিতে হয়
তবু চলে যায়।

৩. উদ্দীপকের ভাব প্রকাশিত হয়েছে নিচের কোন চরণে?

ক. কবর দেশেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিঝুম-নিরালায়　　খ. ফাল্গুনী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত শূন্য মাঠখানি ভরে
গ. হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোঁটে　　ঘ. যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি

৪. উদ্দীপকে 'কবর' কবিতার যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে–

i. কাছের মানুষদের হারানোর ব্যাথা
ii. দূরের মানুষদের আঁকড়ে ধরার প্রবণতা
iii. স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকুলতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ার পর আপনি–

- দাদুর প্রিয়জনদের আর কে কে তাঁকে ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছে তাদের কথা লিখতে পারবেন।
- দাদুর পুত্রবধূ অর্থাৎ নাতির মা স্বামীর মৃত্যুতে যে শোক পেয়েছিলেন তার বর্ণনা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

এইখানে তোর বুজির কবর, পরীর মতন মেয়ে,
বিয়ে দিয়েছিনু কাজিদের বাড়ি বনিয়াদি ঘর পেয়ে।
এত আদরের বুজিরে তাহারা ভালোবাসিত না মোটে
হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোঁটে।
খবরের পর খবর পাঠাত, "দাদু যেন কাল এসে
দুদিনের তরে নিয়ে যায় মোরে বাপের বাড়ির দেশে।"
শ্বশুর তাহার কসাই চামার, চাহে কি ছাড়িয়া দিতে
অনেক কহিয়া সেবার তাহারে আনিলাম এক শীতে।
সেই সোনামুখ মলিন হয়েছে ফোটে না সেথায় হাসি,
কালো দুটি চোখে রহিয়া রহিয়া অশ্রু উঠিছে ভাসি।
বাপের মায়ের কবরে বসিয়া কাঁদিয়া কাটাত দিন,
কে জানিত হায়, তাহারও পরাণে বাজিবে মরণ-বীণ!
কী জানি পচানো জ্বরেতে ধরিল আর উঠিল না ফিরে,
এইখানে তারে কবর দিয়েছি দেখে যাও দাদু! ধীরে।

ব্যথাতুরা সেই হতভাগিনীরে বাসে নাই কেহ ভালো,
কবরে তাহার জড়ায়ে রয়েছে বুনো ঘাসগুলি কালো।
বনের ঘুঘুরা উহু উহু করি কেঁদে মরে রাতদিন,
পাতায় পাতায় কেঁপে উঠে যেন তারি বেদনার বীণ।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ্– দাদু! "আয় খোদা দয়াময়!
আমার বু-জির তরেতে যেন গো ভেস্ত নসিব হয়।"

হেথায় ঘুমায় তোর ছোট ফুপু, সাত বছরের মেয়ে,
রামধনু বুঝি নেমে এসেছিল ভেস্তের দ্বার বেয়ে।
ছোট বয়সেই মায়েরে হারায়ে কী জানি ভাবিত সদা,
অতটুকু বুকে লুকাইয়াছিল কে জানিত কত ব্যথা!
ফুলের মতন মুখখানি তার দেখিতাম যবে চেয়ে,
তোমার দাদির ছবিখানি মোর হৃদয়ে উঠিত চেয়ে।

বুকেতে তাহারে জড়ায়ে ধরিয়া কেঁদে হইতাম সারা,
রঙিন সাঁজেরে ধুয়ে মুছে দিত মোদের চোখের ধারা।

একদিন গেনু গজনার হাটে তাহারে রাখিয়া ঘরে,
ফিরে এসে দেখি সোনার প্রতিমা লুটায় পথের পরে।
সেই সোনামুখ গোলগাল হাত সকলি তেমন আছে।
কী জানি সাপের দংশন পেয়ে মা আমার চলে গ্যাছে।
আপন হস্তে সোনার প্রতিমা কবরে দিলাম গাড়ি,
দাদু! ধর-ধর-বুক ফেটে যায় আর বুঝি নাহি পারি।

এইখানে এই কবরের পাশে আরও কাছে আয় দাদু,
কথা কস্ নাক, জাগিয়া উঠিবে ঘুম-ভোলা মোর যাদু।
আস্তে আস্তে খুঁড়ে দেখ দেখি কঠিন মাটির তলে,
দীনদুনিয়ার ভেস্ত আমার ঘুমায় কিসের ছলে।

* * *

ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবিরের রাগে,
অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে।
মজিদ হইতে আজান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর,
মোর জীবনের রোজকেয়ামত ভাবিতেছি কত দূর।
জোড়হাতে দাদু মোনাজাত কর, "আয় খোদা! রহমান।
ভেস্ত নসিব করিও সকল মৃত্যু-ব্যথিত-প্রাণ।"

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

আবীরের রাগে– উৎসবের রঙে। **কসাই–** পশু হত্যা করে মাংস বিক্রি করা যাদের পেশা। **গেনু–** গেলাম (আঞ্চলিক শব্দ)। **ঘুম ভোলা**– সহজে যাদের ঘুম ভেঙে যায়। **চামার–** চামড়ার কাজ করা বা জুতা সেলাই করা যাদের পেশা। **চেয়ে–** দেখে। **চোখের ধারা–** চোখের পানি। **জোড়হাতে**– দুই হাতে। **দংশন–** কামড়। **দীন দুনিয়ার**– ইহ জগতের। **পচানো জ্বর**– লাগাতার জ্বর, কোনো সময় যে জ্বর ছেড়ে যায় না। **প্রতিমা–** মূর্তি, (এখানে মেয়েকে প্রতিমা বলা হয়েছে)। **বনিয়াদি ঘর**– ভালো বংশের পরিবার। **মরণ-বীণ–** মৃত্যুর সুর। **মৃত্যু-ব্যথিত প্রাণ**– মৃত্যু যাদের প্রাণে ব্যথা দিয়ে হত্যা করেছে অর্থাৎ যারা এখন মৃত। **যবে–** যখন। **রামধনু**– রঙধনু। **শত যে মারিত ঠোঁটে–** ঠোঁটে বলতে এখানে 'কথা' বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কর্কশ, শক্ত এবং কষ্টদায়ক কথাকে কবি ঠোঁটের মার বলেছেন। **সদা–** সব সময়। **সোনা মুখ–** সুন্দর মুখ। **হতভাগিনী–** যার ভাগ্য খারাপ। **হেথায়–** এখানে।

সারসংক্ষেপ

নাতির কাছে দাদু নিজের ছেলে ও ছেলের বউ অর্থাৎ নাতির বাবা ও মায়ের মৃত্যুর কথা বলছেন। হঠাৎ করেই ছেলে অসুস্থ হয় এবং মারা যায়। নাতি তখন ছোটো। কাফনে ঢাকা লাশ কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জিজ্ঞাসা করলে দাদু বোবা হয়ে যান। অবুঝ শিশুকে শব্দ উচ্চারণ করে মৃত্যুর ধারণা দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মৃত্যু যে কত বেদনার ও কত নিষ্ঠুর বাস্তব, তা বোঝানোর ভাষা খুঁজে পাননি দাদু। স্বামীর শোক পুত্রবধূ সহ্য করতে পারলো না। স্বামীর লাঙল জোয়াল বুকে জড়িয়ে এবং বলদের গলা ধরে দিনরাত শুধু কাঁদতো। এমনই করুণ সে কান্না যে মনে হতো গাছের পাতা পর্যন্ত ঝরে যায়। পথিকের চোখ ভিজে ওঠে। অবশেষে শিশুপুত্রকে রেখে অকালেই সে চিরবিদায় নিলো। মৃত্যুর সময়

শ্বশুরের কাছে অনুরোধ করেছিলো স্বামীর মাথালটা যেনো তার কবরের গায়ে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। সে মাথাল পচে গলে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে কিন্তু দাদুর মনের ব্যথার মরণ নেই। নাতিকে তার বাবা-মার জন্য দোয়া করতে বলেন দাদু। অসহায় মানুষ আর কী-ই বা করতে পারে। দোয়া করাই তার শেষ সান্ত্বনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. 'মজিদ' শব্দের অর্থ কী?

ক. মসজিদ　　খ. দরগাহ
গ. বেহেশত　　ঘ. মাথাল

৬. 'কবর' কবিতায় ফুটে উঠেছে–

ক. কবির শোক ও বেদনা　　খ. বৃদ্ধ দাদুর শোক ও বেদনা
গ. কবির জীবনের কাহিনি　　ঘ. বৃদ্ধের নাতির শোক ও বেদনা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ঘরে কান্দে পালা বিলাই গোয়ালে কান্দে গাই।
সকলিত আছে আমার পরাণের দোসর নাই ॥

৭. উদ্দীপকের ভাষারীতির সঙ্গে মিল রয়েছে যে রচনার–

ক. সোনার তরী　　খ. পাঞ্জেরি
গ. কবর　　ঘ. বঙ্গভাষা

৮. উদ্দীপক ও 'কবর' কবিতায় ব্যবহৃত ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য–

ক. গ্রামীণ জীবনের ভাষা　　খ. কৃত্রিম ভাষা
গ. শহুরে জীবনের ভাষা　　ঘ. সাধু ভাষা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. 'কবর' কবিতার পংক্তি সংখ্যা কত?

ক. ১১৮　　গ. ১১৭
খ. ২১৮　　ঘ. ২২০

১০. 'কবর' কবিতায় স্বগতোক্তি হল–

ক. এক গ্রাম্য বৃদ্ধের হাহাকার　　খ. জীবনযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি
গ. গ্রাম্য মানুষের পারিবারিক জীবন　　ঘ. মৃত্যুযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

নিষিদ্ধ কল্পনাগুলি বন্ধ্যা তবু
অলক্ষ্যে প্রসব করে অব্যক্ত যন্ত্রণা।

১১. উদ্দীপকের অভিব্যক্তি 'কবর' কবিতার যে চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে–

ক. মৃত্যুঞ্জয়　　খ. বিলাসী
গ. কল্যাণী　　ঘ. বৃদ্ধ দাদু

১২. উদ্দীপক ও 'কবর' কবিতার ভাষ্য–

ক. স্মৃতি　　খ. বিস্মৃতি
গ. অনুশোচনা　　ঘ. বিদ্রূপ

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

মাওয়া ঘাটে চানাচুর বিক্রি করে সংসার চালায় গণি মিয়া। ঈদের বাজারে বিক্রি-বাট্টা ভাল হওয়ায় তার মন-মেজাজ আজ বেশ ফুরফুরে। কিন্তু বউ বাপের বাড়ি থাকায় মাঝে-মধ্যে তাকে বিষণ্নতায় পেয়ে বসে। আজ সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বউকে আনতে যাবে। বউয়ের মন ভোলানোর জন্য সে ঘাটের দোকান থেকে চুড়ি, ফিতা, ক্রিম, সাবান কিনে নেয়। উপহারগুলো পেয়ে বউ খুশি হবে মনে করে সে আনন্দচিত্তে শ্বশুরবাড়ির দিকে হাঁটা দেয়।

ক. 'Elegy' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'কবর' কবিতায় 'জোড়মানিকেরা' কারা?

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'কবর' কবিতায় কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "কবর' কবিতা কেবল করুণ কাহিনি নয় আনন্দময় জীবনেরও প্রতিচিত্র।" –উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :

ছিল আশা মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয়, আমি তোমার সম্মুখে–
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র তোমায়, করিব
মহাযাত্রা।

ক. 'কবর' কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়?

খ. 'শত যে মারিত ঠোঁটে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের মেঘনাদ 'কবর' কবিতায় কার প্রতিনিধিত্ব করে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "কবর' কবিতার বৃদ্ধ দাদুর স্বজন হারানোর বেদনা উদ্দীপকের অন্তর্লোককেও স্পর্শ করেছে।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক.

'Elegy' শব্দের অর্থ শোক-কবিতা।

খ.

'কবর' কবিতায় 'জোড় মানিকেরা' বলতে কবি বৃদ্ধের পুত্র ও পুত্রবধূকে বুঝিয়েছেন।

'কবর' কবিতায় এক বৃদ্ধ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তার নাতির নিকট প্রবহমাণ জীবনের শোকার্ত দিকগুলো তুলে ধরেছেন। স্মৃতিচারণের এক পর্যায়ে বৃদ্ধ তার পুত্র ও পুত্রবধূর কবর দেখিয়ে বেদনার্ত কণ্ঠে তাদের শোকাবহ মর্মান্তিক মৃত্যুর বর্ণনা দেন। বৃদ্ধের স্নেহের পুত্র অকালে মৃত্যুবরণ করেছিল। স্বামীশোকে বৃদ্ধের পুত্রবধূও স্বামীর অনুগামী হয়। নিবিড় প্রণয়ের কারণে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের বিচ্ছেদ বেদনা সইতে পারেনি। স্বামীকে হারিয়ে বৃদ্ধের পুত্রবধূ সংসারের সমস্ত আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। মৃত্যুর পরও তারা পাশাপাশি কবরে অবস্থান করছে। তাই তাদের 'জোড় মানিকেরা' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

গ.

'কবর' কবিতায় বৃদ্ধ দাদু শাপলার হাটে তরমুজ বিক্রি করে দাদির জন্য উপহার কিনে নিয়ে যেতেন, উদ্দীপকেও গণি মিয়াকে দেখা যায় স্ত্রীর জন্য উপহার নিতে ।

কবিতায় বৃদ্ধ দাদু পুতুল খেলার বয়সে দাদিকে বিয়ে করেছিলেন। খেলার ছলে দাদি সারাদিন বাড়িময় ঘুরে বেড়াতেন। দাদু কখনোই তাকে দৃষ্টির আড়াল করতে চাইতেন না। দাদি যখন বাপের বাড়ি বেড়াতে যেতেন তখন দাদুর কাছে অনুনয় করতেন- তিনি যেন দাদিকে দেখতে বাপের বাড়ি যান।

উদ্দীপকে মাওয়া ঘাটের গণি মিয়া চানাচুর বিক্রেতা। ঈদের বাজার হওয়াতে তার আয়- রোজগারও ভাল হয়েছে। কিন্তু স্ত্রী বাপের বাড়ি অবস্থান করায় মন তার বিষণ্ন থাকে। স্ত্রীর মন ভোলানোর জন্য সে মাওয়া ঘাট থেকে চুড়ি, ফিতা, ক্রিম,

সাবান ইত্যাদি কিনে নেয়। উপহারগুলো পেয়ে তার স্ত্রী খুশি হবে মনে করে সে শ্বশুরবাড়ির পথে পথ চলতে শুরু করে। 'কবর' কবিতায়ও দেখা যায় দাদু তরমুজ বিক্রি করে ওই পয়সা দিয়ে দাদির জন্য পুঁতির মালা আর দেড় পয়সার তামাক ও মাজন কিনতেন। সন্ধ্যাবেলায় দাদু যখন উপহারগুলো নিয়ে দাদির সামনে উপস্থিত হতেন তখন তার আর খুশির সীমা থাকত না। দাদিকে খুশি করার জন্য দাদুর সবসময় একটা সযত্ন প্রয়াস থাকত। উদ্দীপকে গণি মিয়াও চেয়েছে তার স্ত্রীকে সবসময় প্রসন্ন রাখতে। বস্তুত কবিতার বিষয়বস্তু এভাবেই উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ.

'কবর' কবিতায় কেবল করুণ কাহিনি নয় জীবনের কিছু সুখস্মৃতিও ফুটে উঠেছে, যা উদ্দীপকেও পরিলক্ষিত হয়।

প্রত্যেক কবিই জীবনের কোনো না কোনো প্রেক্ষাপট নিয়ে কবিতা রচনা করেন। কবি জসীমউদ্‌দীনের এই প্রেক্ষাপটটি হচ্ছে আবহমানকালের বাঙালির গ্রামীণ জীবন। এই কবিতায় গ্রামীণ সমাজের নানা ঘটনার সমাবেশ ঘটলেও সবচেয়ে বেশি মূর্ত হয়েছে শোকার্ত এক বৃদ্ধের হৃদয়ের হাহাকার। কিন্তু এই শোকের পাশাপাশি কবিতায় কিছু আনন্দঘন মুহূর্তেরও স্ফূরণ ঘটেছে।

উদ্দীপকে মাওয়া ঘাটের নিম্ন আয়ের একজন মানুষের জীবনের খণ্ডচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। এই চিত্র শোকের নয়, আনন্দের এবং সুখের। এখানে গণি মিয়া তার স্ত্রীর মন প্রসন্ন করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে। স্ত্রীর জন্য সাবান, ক্রিম, ফিতা ইত্যাদি উপহার সামগ্রী ক্রয় করেছে। 'কবর' কবিতায় দাদুও খুশি হবে বলে দাদির জন্য তরমুজ বিক্রি করে পুঁতির মালা আর তামাক ও মাজন কিনেছে। এভাবে দেখা যায়, উদ্দীপকের গণি মিয়া স্ত্রীর মন রক্ষা করার জন্য যে প্রয়াস চালিয়েছে তার সঙ্গে বৃদ্ধ দাদুর দাদিকে খুশি করার প্রচেষ্টার মিল পাওয়া যায়।

উদ্দীপক এবং 'কবর' কবিতায় আমরা জীবনের কিছু আনন্দঘন চিত্র লক্ষ করি। পুতুল খেলার বয়সে দাদু ও দাদির বিয়ে হয়েছে। দাদির সোনার বরণ মুখ দেখার জন্য দাদু ঘুরে-ফিরে তার দিকে তাকাতেন। দাদি বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় দাদুকে খুব অনুনয় করতেন তাকে দেখতে যাওয়ার জন্য। শাপলার হাটে দাদু তরমুজ বিক্রি করতেন। তারপর দাদির জন্য পুঁতির মালা কিনে তাকে দেখতে যেতেন। এভাবে আমরা দেখি কবিতাটিতে দাদুর আনন্দময় জীবনের কিছু চিত্রও হার্দিক ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। যদিও কাহিনিটি শোকের আবহে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। তাই বলা যায়, 'কবর' কবিতাটি কেবল শোকের কাহিনি নয়, জীবনের কিছু আনন্দঘন মুহূর্তেরও প্রতিচিত্র।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

বাইশ বছরের বুকের মানিককে কবরে শুইয়ে দিয়েছে এখানে।
এই ই শেষ নয়, শুনুন; বলি
মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছিলাম পলাশতলী
সেখানেও আকাল! মানুষে মানুষ খায়।
তিন দিনের উপবাসী আর লজ্জা বস্ত্রহীন হয়ে নিদারুণ ব্যথায়।
দড়ি কলসী বেঁধে পুকুরের জলে ডুবে মরেছিল একদিন সন্ধ্যায়।

ক. কাকে 'ঘুম ভোলা মোর যাদু' বলা হয়েছে?
খ. 'মোর জীবনের রোজ কেয়ামত' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. 'কবর' কবিতায় বৃদ্ধ দাদুর জীবনের কোন কোন ঘটনা উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপক এবং 'কবর' কবিতার চরিত্রগুলো যেন একই শোকযন্ত্রণায় কাতর।" –মন্তব্যটি কি যথার্থ? বিচার করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. ঘ ৩. ঘ ৪. ক ৫. ক ৬. খ ৭. গ ৮. ক ৯. ক ১০. ক ১১. ঘ ১২. ক

তাহারেই পড়ে মনে

সুফিয়া কামাল

কবি-পরিচিতি

সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালের ২০ জুন বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস কুমিল্লায়। তাঁর পিতা সৈয়দ আবদুল বারী ও মাতা সাবেরা বেগম। কবির বয়স যখন মাত্র সাত বছর তখন তাঁর পিতা মারা যান। বারো বছর বয়সে সৈয়দ নেহাল হোসেনের সঙ্গে কবির বিয়ে হয়। আধুনিকমনা ও সাহিত্যানুরাগী স্বামীর উৎসাহে কবির সাহিত্যসাধনা শুরু। ১৯৩২ সালে স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু হয়। অতঃপর ১৯৩৯ সালে কামালউদ্দীন আহমেদের সঙ্গে কবির পুনরায় বিয়ে হয়। পরিবারের নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তিনি স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন। বেগম রোকেয়ার চিন্তাধারা তাঁর মনে বেশ প্রভাব ফেলেছিল। দেশভাগের পূর্বে তিনি নারীদের জন্য প্রকাশিত 'বেগম' পত্রিকার সম্পাদক হন। ভাষা-আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং এতে অংশ নিতে নারীদের উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি শিশু-সংগঠন 'কচিকাঁচার মেলা' প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া ১৯৬১-তে তিনি 'ছায়ানটে'র সভাপতি ও ১৯৬৯-এ 'মহিলা সংগ্রাম কমিটি'র সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি নারী জাগরণ, সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা সকল প্রগতিবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে শুধু কবি হিসেবেই নয়, 'জননী' অভিধায়ও ভূষিত হয়েছেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি স্বাধীনতা দিবস পদক, একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, বেগম রোকেয়া পদক, নাসির উদ্দীন স্বর্ণপদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। **তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :**

কাব্যগ্রন্থ : *সাঁঝের মায়া* (১৯৩৮), *মায়া কাজল* (১৯৫১), *মন ও জীবন* (১৯৫৭), *উদাত্ত পৃথিবী* (১৯৬৪);
গল্পগ্রন্থ : *কেয়ার কাঁটা* (১৯৩৭);
ভ্রমণকাহিনি : *সোভিয়েতে দিনগুলি* (১৯৬৮);
স্মৃতিকথা : *একাত্তরের ডায়েরি* (১৯৮৯)।

ভূমিকা

'তাহারেই পড়ে মনে' শীর্ষক কবিতাটি সুফিয়া কামালের বিখ্যাত কাব্য *সাঁঝের মায়া* থেকে সংকলিত হয়েছে। এই কবিতাটি প্রথম ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটি একটি সংলাপ নির্ভর রচনা। এই কবিতায় প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রকাশিত হয়েছে। এখানে কবির ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। সহজ সরল ভাষায় কবি প্রকৃতি এবং তাঁর হৃদয়ের বেদনাকে অপূর্ব শিল্প নৈপুণ্যে প্রকাশ করেছেন।

উদ্দেশ্য

সুফিয়া কামালের 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি পড়ার পর আপনি–

- প্রকৃতিতে বসন্তের রূপ বর্ণনা করতে পারবেন।
- কবির ব্যক্তিজীবনের ঘটনা কীভাবে তাঁকে বসন্তের রূপ আস্বাদনে বিমুখ করেছিল তা আলোচনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

"হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়,
বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?"
কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি–
"দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?
বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি আমের মুকুল?
দখিনা সমীর তার গন্ধে গন্ধে হয়েছে কি অধীর আকুল?"

"এখনো দেখনি তুমি?" কহিলাম, "কেন কবি আজ
এমন উন্মনা তুমি? কোথা তব নব পুষ্পসাজ?"
কহিল সে সুদূরে চাহিয়া–
"অলখের পাথার বাহিয়া
তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান?
ডেকেছে কি সে আমারে? শুনি নাই, রাখি নি সন্ধান।"

কহিলাম, "ওগো কবি! রচিয়া লহ না আজও গীতি,
বসন্ত-বন্দনা তব কণ্ঠে শুনি– এ মোর মিনতি।"
কহিল সে মৃদু মধু-স্বরে–
"নাই হলো, না হোক এবারে–
আমারে গাহিতে গান, বসন্তেরে আনিতে বরিয়া–
রহেনি, সে ভুলেনি তো, এসেছে তা ফাগুনে স্মরিয়া।"

কহিলাম : "ওগো কবি, অভিমান করেছ কি তাই?
যদিও এসেছে তবু তুমি তারে করিলে বৃথাই।"
কহিল সে পরম হেলায়–
"বৃথা কেন? ফাগুন বেলায়
ফুল কি ফোটেনি শাখে? পুষ্পারতি লভেনি কি ঋতুর রাজন?
মাধবী কুঁড়ির বুকে গন্ধ নাহি? করে নাই অর্ঘ্য বিরচন?"

"হোক, তবু বসন্তের প্রতি কেন এই তব তীব্র বিমুখতা?"
কহিলাম, "উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা?"
কহিল সে কাছে সরে আসি–
"কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী–
গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে
রিক্ত হস্তে! তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোনো মতে।"

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অগোচর– দেখা যাবে না এমন, অপ্রত্যক্ষ। **অনুৎসুক–** আগ্রহ নেই এমন। **অলখ–** অলক্ষ, দৃষ্টির অগোচরে। **অর্ঘ্য–** পূজার উপকরণ। **অর্ঘ্য বিরচন–** অঞ্জলি বা উপহার রচনা। প্রকৃতি বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে ফুল ও তার সৌরভ উপহার দিয়ে বসন্তকে বরণ করে। **উত্তরী–** চাদর, উত্তরীয়। **উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা–** কবিভক্ত বুঝতে পারছেন না, কবি যথারীতি সানন্দে বসন্ত বন্দনা না করে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন কেন। **এখনো দেখনি তুমি?–** কবিভক্তের এ কথায় আমরা নিশ্চিত হই প্রকৃতিতে বসন্তের সব লক্ষণ মূর্ত হয়ে উঠেছে। অথচ কবি তা লক্ষ করছেন না। **কুহেলি–** কুয়াশা। **কুহেলি উত্তরী হলে মাঘের সন্ন্যাসী–** কবি শীতকে মাঘের সন্ন্যাসীরূপে কল্পনা করেছেন। বসন্ত আসার আগে সর্বত্যাগী সর্বরিক্ত সন্ন্যাসীর মত মাঘের শীত যেন কুয়াশার চাদরে মিলিয়ে গেছে। **কোথা তব বন পুষ্পসাজ–** বসন্ত এসেছে অথচ কবি নতুন ফুলে ঘর সাজাননি। নিজেও ফুলের অলংকারে সাজেননি। **করিলে বৃথাই–** ব্যর্থ করলে। অর্থাৎ কবি-ভক্তের অনুযোগ-বসন্তকে কবি বরণ না করায় বসন্তের আবেদন গুরুত্ব হারিয়েছে। **তব বন্দনায়–** তোমার রচিত বন্দনা-গানের সাহায্যে। অর্থাৎ বন্দনা-গান রচনা করে বসন্তকে কি তুমি বরণ করে নেবে না? **তাহারেই পড়ে মনে–** প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ত ও বিষণ্ন ছবি। কবির মন দুঃখ ভারাক্রান্ত। তার কণ্ঠ নীরব। শীতের করুণ বিদায়কে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। তাই বসন্ত তার মনে কোনো সাড়া জাগাতে পারছে না। বসন্তের সৌন্দর্য তার কাছে অর্থহীন, মনে কোনো আবেদন জানাতে পারছে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর প্রথম স্বামী ও কাব্যসাধনার প্রেরণা–পুরুষের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির অন্তরে যে বিষণ্নতা জাগে তারই সুস্পষ্ট প্রভাব ও ইঙ্গিত এ কবিতায় ফুটে উঠেছে। **দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?**– কবির জিজ্ঞাসা– বসন্তের দখিনা বাতাস বইতে শুরু করেছে কি না। উদাসীন কবি যে তা লক্ষ করেননি তার এই জিজ্ঞাসা থেকে তা স্পষ্ট হয়। **দিগ্বিদিক–** সর্বদিক। **নীরব কেন–** উদাসীন হয়ে আছেন কেন? কেন কাব্য ও গান রচনায় সক্রিয় হচ্ছে না। **পাথার–** সমুদ্র। **পুষ্পারতি–** ফুলের বন্দনা বা নিবেদন। **পুষ্পারতি লভেনি কি ঋতুর রাজন?–** ঋতুরাজ বসন্তকে বরণ ও বন্দনা করার জন্য গাছে গাছে ফুল ফোটেনি? অর্থাৎ বসন্তকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্যেই যেন ফুল ফোটে। **পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে–** শীত প্রকৃতিতে দেয় রিক্ততার রূপ। গাছের পাতা যায় ঝরে। গাছ হয় ফুলহীন। শীতের এ রূপকে বসন্তের বিপরীতে স্থাপন করা হয়েছে। প্রকৃতি বসন্তের আগমনে ফুলের সাজে সাজলেও কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ততার ছবি। শীত যেন সর্বরিক্ত সন্ন্যাসীর মতো কুয়াশার চাদর গায়ে পত্রপুষ্পহীন দিগন্তের পথে চলে গেছে। **ফাগুন যে এসেছে ধরায়–** পৃথিবীতে ফাল্গুন অর্থাৎ বসন্তের আবির্ভাব ঘটেছে। **বরিয়া–** বরণ করে। **বসন্তেরে আনিতে... ফাগুন স্মরিয়া–** কবি বন্দনা-গান রচনা করে বসন্তকে বর্ণনা করলেও বসন্ত অপেক্ষা করেনি। ফাল্গুন আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিতে বসন্ত এসেছে। **বাতাবি নেবুর ফুল...অধীর আকুল–** বসন্তের আগমনে বাতাবি লেবুর ফুল ও আমের মুকুলের গন্ধে দখিনা বাতাস দিগ্বিদিক সুগন্ধে ভরে তোলে। কিন্তু উন্মনা কবি এসব কিছুই লক্ষ করেননি। কবির জিজ্ঞাসা তাঁর উদাসীনতাকেই স্পষ্ট করে। **মাধবী–** বাসন্তী লতা বা তার ফুল। **রিক্ত–** শূন্য, নিঃস্ব। **রচিয়া–** রচনা করে। **লহ–** নাও। **লবে–** নেবে। **হে কবি–** কবিভক্ত এখানে কবিকে সম্বোধন করেছেন। **সমীর–** বাতাস। **স্মরিয়া–** স্মরণ করে।

সারসংক্ষেপ

কবি সুফিয়া কামাল প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের রং বদলায়। প্রকৃতিতে বসন্ত এলে, প্রকৃতি অপরূপ রূপে সজ্জিত হলে তার ঢেউ মানব মনেও এসে পড়ে। বসন্তে প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য কবিমনে খুশির জোয়ার আনবে, কবিকে ভাবে-ছন্দে-সুরে ফুটিয়ে তুলবেন এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু কোনো কারণে কবির মনে বসন্তের আগমন কোনো প্রভাব ফেলেনি, বসন্ত কবির হৃদয়কে আন্দোলিত করতে পারছে না। তাঁর দৃষ্টি এখনো শীতের দিকে, শীতকে তিনি কোনোভাবেই ভুলতে পারছেন না।

কবি সুফিয়া কামালের সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা ছিলেন স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন, যাঁর আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছে। তিনি সর্বত্যাগী সর্বরিক্ত সন্ন্যাসীর মতো বিদায় নিয়েছেন– যা শীতের সঙ্গে তুলনীয়। যার উৎসাহ-উদ্দীপনায় কবি বর্তমানের একজন সফল কবি– যা বসন্তের সঙ্গে তুলনীয়। শীত রিক্তহস্তে চলে যাবার কারণেই বসন্ত এসেছে ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে। কিন্তু যে শীত তথা প্রথম স্বামীর কারণেই বসন্ত তথা বর্তমান সফলতার

আগমন, সেই শীতকে তিনি কোনো ভাবেই ভুলতে পারছেন না। ফলে প্রকৃতিতে যে বসন্ত তা কবিকে স্পর্শ করছে শীতরূপে। শীতের রিক্ততার হাহাকার যেন কবির জীবনে স্বজন হারানোর বেদনাকেই প্রতিধ্বনিত করে। এ কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে কে চলে গেছে?

ক. কবির স্বামী
খ. মাঘের সন্ন্যাসী
গ. বসন্ত ঋতু
ঘ. বসন্তের কোকিল

২.দখিনা সমীর ফুলের গন্ধে আকুল হয়েছে কেন?

ক. নবান্ন উৎসবে
খ. শীতের আগমনে
গ. বসন্তের আগমনে
ঘ. নববর্ষের উৎসবে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ভুলিতে পারি না তারে ভোলা যায় না,
বারে বারে মনে পড়ে কেন জানি না।

৩. উদ্দীপকের চরণদ্বয়ের সঙ্গে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন চরণের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. আসিবে এবার ঋতুরাজ বুঝি।
খ. তাহারেই পড়ে মনে ভুলিতে পারি না কোনোমতে।
গ. তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান?
ঘ. রহেনি, সে ভুলে নিতে এসেছে ফাগুন স্মরিয়া।

৪. উদ্দীপক ও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে–

i. স্মৃতিকাতরতা
ii. প্রিয়জন বিচ্ছেদ
iii. জীবন প্রবাহ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'পাথার' শব্দের অর্থ কী?

ক. নদী
খ. সমুদ্র
গ. সমীর
ঘ. কুয়াশা

৬. 'পুষ্পারতি' বলতে বোঝানো হয়েছে–

ক. পুষ্পের সৌন্দর্য
খ. শীতের আগমন
গ. পুষ্পের বন্দনা
ঘ. নবান্নের উৎসব

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

হিম কুহেলির অন্তর তলে আজিকে পুলক জাগে
রাঙিয়া উঠেছে পলাশ কণিকা মধুর রঙিন রাগে।

৭. উদ্দীপকটিতে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে–

ক. বসন্তের আগমন
খ. কবির বিদায়
গ. প্রকৃতির সৌন্দর্য
ঘ. কবির রিক্ততা

৮. উদ্দীপক ও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় যে সুর ধ্বনিত হয়েছে–

i. প্রকৃতি ও মানবমনের সৌন্দর্য

ii. প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতা
iii. জীবনের প্রবহমাণতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

যারে খুব বেসেছিনু ভাল
সে মোরে ছেড়ে চলে গেল
যে ছিল মোর জীবন ছায়া
রেখে গেছে শুধু মায়া।
লাগে না ভালো অপরূপ প্রকৃতি
যতই করুক কেউ মিনতি।

ক. 'দখিন দুয়ার গেছে খুলি?' –প্রশ্নটি কে করেছিল?
খ. শীতকে কবি 'মাঘের সন্ন্যাসী' বলেছেন কেন?
গ. উদ্দীপকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকটি 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করেছে।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক.

'দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?' 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় এ প্রশ্নটি কবি করেছিলেন।

খ.

শীতের রিক্ততার সঙ্গে নিজের নিঃসঙ্গ জীবনের তুলনা করে কবি সুফিয়া কামাল শীতকে মাঘের সন্ন্যাসী বলেছেন।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় প্রকৃতির পালাবদলে আগমন ঘটেছে ঋতুরাজ বসন্তের। কিন্তু সৌন্দর্যময় বসন্ত কবির অন্তরে কোনো সাড়া জাগায়নি। কারণ, কবি অতীত দিনের স্মৃতিচারণে বিভোর রয়েছেন। শীত ঋতু পূর্বেই পুষ্পশূন্য হয়েছে, রিক্ত হস্তে বিদায় নিয়েছে দিগন্তের পথে। মূলত শীতের এ রিক্ততার সঙ্গে কবি তাঁর জীবনের শূন্যতার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। এ কারণে তিনি শীতকে 'মাঘের সন্ন্যাসী' বলেছেন।

গ.

উদ্দীপকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার প্রিয়জনকে হারানোয় বেদনার দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রকৃতির মুক্ত আবহে মহাসমারোহে বসন্ত ঋতুর আগমন ঘটেছে অনিন্দ্য সুন্দর রূপরাশি নিয়ে। কিন্তু কবি বসন্তের এ আগমনে সাড়া দিতে পারছেন না। তিনি বসন্তের প্রতি বিমুখ। কবি শীতের রিক্ত নিরব বিদায়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়েছেন। কেননা শীতের রিক্ত নিরব প্রস্থান কবিমনে তার প্রিয়জন হারানোর স্মৃতিকে মনে করিয়ে দেয়।

উদ্দীপকে কবির প্রিয়জন হারানোর গভীর বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। উদ্দীপকের কবি যাকে খুব ভালোবেসেছিলেন সে তাকে ছেড়ে চলে গেছে। কবির জন্য রেখে গেছে শুধু মায়া। ফলে অপরূপ প্রকৃতির প্রতিও কবি বিমুখ। তেমনিভাবে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি সুফিয়া কামালের প্রেরণাদাতা তাঁর স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন। ফলে কবি রিক্ততা ও শূন্যতায় আচ্ছন্ন হয়েছেন। জীবনে এ গভীর শূন্যতার জন্য কবি প্রকৃতি সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েছেন। কবি নিজ হৃদয়ের রিক্ততা উপলব্ধি করেছিলেন শীতের পুষ্পশূন্য দিগন্তের মাঝে। তাই তিনি বসন্তের রাজকীয় আগমনের চেয়ে শীতের রিক্ত প্রস্থান নিয়ে বেশি ভেবেছেন।

ঘ.

উদ্দীপক ও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতা উভয়টিতে কবি হৃদয়ের রিক্ততা ও বিষণ্নতা প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকৃতিতে বসন্ত এসেছে তার নিজস্ব নিয়মে। কিন্তু কবি আনন্দচিত্তে বসন্তকে বরণ করতে পারছেন না। কেননা তাঁর ব্যক্তিজীবন প্রিয়জন হারানোর বেদনায় ভারাক্রান্ত। শীতের রিক্ত বিদায়ে কবি নিজ প্রিয় প্রেরণাকে হারানোর স্মৃতিতে কাতর হয়েছেন। তাই বসন্তের প্রাণময় আগমনেও তিনি শীতের প্রস্থানে বিরহকাতর।

উদ্দীপকে দেখা যায় কবি তার ভালোবাসার মানুষটি চলে যাওয়ায় বিরহে কাতর। ভালোবাসার এই মানুষটি তার জীবনে ছায়া হয়ে প্রেরণা দিয়েছিল। তাই তার অনুপস্থিতি কবিকে প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি উদাসীন করে তোলে। তার মন কেবল পড়ে থাকে সেই প্রিয় মানুষের স্মৃতিময়তায়। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায়ও এই স্মৃতিকাতরতা প্রকাশিত হয়েছে। কবি নিজ হৃদয়ের রিক্ততা উপলব্ধি করেছিলেন শীতের পুষ্পশূন্য দিগন্তের বলয়ে। তাই প্রকৃতির সবকিছুতেই তার বিমুখতা দেখা দিয়েছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশ ও সুফিয়া কামালের 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতা উভয়টিতেই কবির ব্যক্তিজীবনের বিষাদময় ঘটনা রেখাপাত করেছে। শীতের বিদায়ের মুহূর্তে বসন্তের আগমন ঘটলেও কবির মনে কোনো আবেদন সৃষ্টি হয়নি। শীতের রিক্ততায় প্রিয়জনকে হারিয়েছেন বলে শীতকে কোনোমতেই কবি ভুলতে পারছেন না। জীবনের ক্ষণে ক্ষণে প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা কবিমনকে নিরবধি আচ্ছন্ন করে রাখে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করেছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

ওরে আয় রে তবে, মাতরে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
পিছন-পানের বাঁধন হতে চল ছুটে আজ বন্যাস্রোতে,
আপনাকে আজ দখিন-হাওয়ায় ছড়িয়ে দে-রে দিগন্তে।
বাঁধন যত ছিন্ন করো আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

ক. 'সাঁঝের মায়া' কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা?

খ. 'হে কবি নীরব কেন?' –কবি এখানে কোন কারণে নীরব?

গ. উদ্দীপকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. " উদ্দীপক ও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার উদ্দিষ্ট বসন্ত-বন্দনা।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. গ ৩. খ ৪. ক ৫. খ ৬. গ ৭. ক ৮. ঘ

সেই অস্ত্র

আহসান হাবীব

কবি-পরিচিতি

আহসান হাবীব ১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারি পিরোজপুর জেলার শঙ্করপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হামিজুদ্দীন হাওলাদার ও মাতা জমিলা খাতুন। পারিবারিকভাবে আহসান হাবীব সাহিত্য-সংস্কৃতির আবহের মধ্যে বড় হয়েছেন। সেই সূত্রে ছাত্রজীবন থেকেই তিনি লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত হন। পিরোজপুর সরকারি স্কুল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে বরিশাল বিএম কলেজে ভর্তি হন কিন্তু অর্থাভাবে পড়াশুনা অসমাপ্ত রেখে ১৯৩৬ সনে তিনি জীবিকার সন্ধানে কলকাতা চলে যান। এ-সময় থেকেই তাঁর কঠিন জীবন-সংগ্রামের এবং প্রকৃত কাব্যসাধনার শুরু। কলকাতার জীবনে আহসান হাবীব সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং মৃত্যু অবধি এ পেশাতেই নিয়োজিত ছিলেন। দেশবিভাগের পর ১৯৫০-এর দিকে আহসান হাবীব ঢাকা চলে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এ-সময় থেকেই তাঁর কাব্যসাধনার দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলাদেশের *দৈনিক বাংলা* পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী ও ভাবুক প্রকৃতির। নদী বিধৌত বৃহত্তর বরিশালের পল্লিপ্রকৃতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলো শৈশবেই। গভীর জীবনবোধ ও আশাবাদ তাঁর কবিতাকে বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা দান করেছে। মেধার মনন ও আবেগকে শিল্পে রূপ দেয়ার অসাধারণ দক্ষতা ছিলো তাঁর। তিনি সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং আর্তমানবতার সপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। অন্যদিকে স্বদেশ ও মাতৃভাষার স্বরূপ-সন্ধান তাঁর কাব্যসাধনার প্রেরণা। বর্তমানের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক-সাংবাদিক মঈনুল আহসান সাবের আহসান হাবীবের বড় ছেলে। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ইউনেস্কো সাহিত্য পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। আহসান হাবীব ১৯৮৫ সালের ১০ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কাব্যগ্রন্থ : *রাত্রিশেষ* (১৯৪৭), *ছায়া হরিণ* (১৯৬২), সারা দুপুর (১৯৬৪), আশায় বসতি (১৯৭৪), *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* (১৯৭৬), *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* (১৯৮০), *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ* (১৯৮৫);

উপন্যাস : *আরণ্য নীলিমা* (১৯৬২), *রানী খালের সাঁকো* (১৯৬৫);

শিশুতোষ : *ছুটির দিন দুপুরে* (১৯৭৮), *বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর* (১৯৭৭)।

ভূমিকা

আহসান হাবীব রচিত 'বিদীর্ণ দর্পণে মুখ' কাব্যগ্রন্থ থেকে 'সেই অস্ত্র' কবিতাটি সংকলন করা হয়েছে। কবিতাটিতে কবি সহজ সরল ভাষায় তাঁর প্রত্যাশিত ভালোবাসা মানবসমাজে ফিরে পাওয়ার কামনা ব্যক্ত করেছেন। কবিতাটি অন্ত্যমিলহীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর পর্বগুলোর বিন্যাসও অসম। কবি বিশ্ববাসীকে হিংসা-বিদ্বেষ বিসর্জন দিয়ে ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করেছেন।

উদ্দেশ্য

আহসান হাবীবের 'সেই অস্ত্র' কবিতাটি পড়ার পর আপনি–

- কবি 'ভালোবাসা' নামক অবিনাশী অস্ত্র মানুষের কাছে ফিরিয়ে দিতে প্রত্যাশী কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- 'ভালোবাসা'-কে কবি অবিনাশী অস্ত্র হিসেবে কেন আখ্যায়িত করেছেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- একমাত্র 'ভালোবাসা' দিয়েই পৃথিবীর সকল প্রকার হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, জাত্যাভিমান দূর করা সম্ভব– কবির এই ধারণা আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও
সভ্যতার সেই প্রতিশ্রুতি
সেই অমোঘ অনন্য অস্ত্র
আমাকে ফিরিয়ে দাও।
সেই অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও
যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র হবে আনত
যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
অরণ্য হবে আরও সবুজ
নদী আরও কল্লোলিত
পাখিরা নীড়ে ঘুমোবে।
যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
ফসলের মাঠে আগুন জ্বলবে না
খাঁ খাঁ করবে না গৃহস্থালি।
সেই অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও
যে অস্ত্র ব্যাপ্ত হলে
নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরবে না
মানব বসতির বুকে
মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত
লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে না পঙ্গু-বিকৃত
আমাদের চেতনা জুড়ে তারা করবে না আর্তনাদ
সেই অস্ত্র যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
বার বার বিধ্বস্ত হবে না ট্রয়নগরী।
আমি সেই অবিনাশী অস্ত্রের প্রত্যাশী
যে ঘৃণা বিদ্বেষ অহংকার
এবং জাত্যভিমানকে করে বার বার পরাজিত।
যে অস্ত্র আধিপত্যের লোভকে করে নিশ্চিহ্ন
যে অস্ত্র মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না
করে সমাবিষ্ট
সেই অমোঘ অস্ত্র– ভালোবাসা
পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করো।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অমোঘ– অব্যর্থ, সার্থক, অবশ্যম্ভাবী। **জাত্যভিমান সমাবিষ্ট–** কোনো যুক্তি ছাড়াই নিজ জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করার অহংকারী মনোভাব। **ট্রয়নগরী–** প্রাচীন তুরস্কের স্থাপত্যকলায় নন্দিত এক শহর। মানুষের হিংসা-বিদ্বেষ ঈর্ষা আর দম্ভের শিকার হয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে বারংবার ধ্বংস হয়েছে এই নগরী। যুদ্ধের নির্মমতার এক চিরায়ত দৃষ্টান্ত এই ট্রয়। **মানব বসতির বুকে মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে পঙ্গু-বিকৃত–** ভালোবাসাহীন বিদ্বেষপূর্ণ পৃথিবীতে যুদ্ধের অনিবার্য ক্ষতি সম্পর্কে নিজের উৎকণ্ঠা কবি এখানে প্রকাশ করেছেন। অনুমান করা যায়, কবিচৈতন্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকিতে ঘটে যাওয়া নৃশংসতার স্মৃতি জাগ্রত ছিল। তাই আণবিক বোমার আঘাতে মৃত কিংবা

প্রজন্ম-পরম্পরায় পঙ্গুত্ব বরণকারী বহু মানুষের আর্তনাদ কবির এই যুদ্ধবিরোধী মননকে আন্দোলিত করেছে। **যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র হবে আনত–** কবি বিশ্বাস করেন, ভালোবাসা দিয়ে মানুষের হিংসা বিদ্বেষ দূর করা সম্ভব। ভালোবাসা থাকলে মানুষ মানুষকে শত্রু ভাববে না, কৃষকের দুঃখ-জ্বালার অবসান হবে এবং বিদ্রোহের আগুন জ্বলবে না। **যে অস্ত্র ব্যাপ্ত হলে নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরবে না–** কবি এখানে যুদ্ধে ব্যবহৃত ছোট-বড় ক্ষেপণাস্ত্রের কথা বুঝিয়েছেন। কবি চান, মানুষ যেন যুদ্ধের ভয়াবহতায় জড়িয়ে না পড়ে, বিশ্বে যেন শান্তি নিশ্চিত হয়। **সমাবিষ্ট–** সমভাবে আবিষ্ট, সমাবেশ হয়েছে এমন, সমবেত হওয়া অর্থে।

সারসংক্ষেপ

কবি আহসান হাবীবের 'সেই অস্ত্র' কবিতাটি শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্য চিরায়ত প্রার্থনাসংগীতের মতো। কবির একমাত্র প্রত্যাশা 'ভালোবাসা' নামের মহান অস্ত্রকে পুনরায় এই মানবসমাজে ফিরে পাওয়া। ভালোবাসা মানুষকে যেমন সকল কাজে শক্তি জোগায়, তেমনি ভালোবাসা সকল অমঙ্গল থেকে রক্ষার উপায় বলে দেয়। এ জন্য কবি বিশ্ববাসীর কাছে এই ভালোবাসা ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ করেছেন। হিংসা, লোভ পরিহার করতে পারলে পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করবে, পৃথিবী এগিয়ে যাবে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে। এ সবই সম্ভব হবে কেবল মানুষের কাঙ্ক্ষিত ভালোবাসা ছড়িয়ে দেবার মাধ্যমে। কবির প্রত্যাশা, বিশ্বময় ভালোবাসা ছড়িয়ে দিয়ে মানবিকতার হৃতবোধ জাগ্রত করা। কবি জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকির ভয়াবহতা, হিংসা-বিদ্বেষ, ঈর্ষা আর দম্ভের বলি ট্রয় নগরীর ধ্বংসলীলা প্রভৃতি নৃশংসতার স্মৃতি তাড়িত হয়ে পৃথিবীবাসীর জন্য প্রত্যাশিত ভালোবাসার প্রত্যাবর্তন কামনা করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রাচীন তুরস্কের স্থাপত্যকলায় নন্দিত যে শহরটি–

ক. মিনার্ভা　　খ. এথেন্স
গ. ট্রয়　　ঘ. ব্যাবিলন

২. 'জাত্যভিমান' শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে–

ক. আভিজাত্য গর্ব　　খ. মানবীয়তা
গ. জিঘাংসা প্রবৃত্তি　　ঘ. ভালোবাসা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যুদ্ধাহত সৈনিকদের সেবা দিয়ে অসহ্য যন্ত্রণা দূর করেছিলেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। মানবসেবার জন্য আজও তিনি পৃথিবীর বুকে অমর হয়ে আছেন।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে 'সেই অস্ত্র' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে–

ক. যুদ্ধের উন্মাদনায়　　খ. অহংকারী মনোভাবে
গ. স্বদেশপ্রেমে　　ঘ. মানবপ্রেমে

৪. উদ্দীপক ও 'সেই অস্ত্র' কবিতায় মানুষের প্রতি প্রকাশিত হয়েছে–

ক. বিদ্বেষ ও ঘৃণা　　খ. ভালোবাসা
গ. জাত্যভিমান　　ঘ. লোভ-লালসা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'সেই অস্ত্র' কবিতাটি কবি আহসান হাবীবের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?

ক. বিদীর্ণ দর্পণে মুখ　　খ. রাত্রিশেষ
গ. সারাদুপুর　　ঘ. ছায়াহরিণ

৬. 'অরণ্য হবে আরো সবুজ' বাক্যাংশটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে–

ক. প্রকৃতির আরো স্বাভাবিকতা　　খ. প্রকৃতির আরো নগ্নতা

গ. প্রকৃতির আরো উন্মুক্ততা　　ঘ. প্রকৃতির আরো কোমলতা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

হিংসা দ্বেষ রহিবে না কেহ কারে করিবে না ঘৃণা
পরস্পরে বাঁধি দিব প্রীতির বন্ধনে।

৭. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ও 'সেই অস্ত্র' কবিতার মিল কোথায়?

ক. শান্তি প্রতিষ্ঠায়　　খ. হিংসা ও বিদ্বেষে
গ. অস্ত্র প্রতিযোগিতায়　　ঘ. যুদ্ধের সফলতায়

৮. উদ্দীপক ও 'সেই অস্ত্র' কবিতার উপজীব্য বিষয় হচ্ছে–

i. আশাবাদী চেতনা
ii. জাত্যভিমান
iii. শ্রেণিদ্বন্দ্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

সভ্যতার সংকট কীভাবে যেন বার বার পৃথিবীতে ফিরে আসে। গেল বছর আফ্রিকার একটি দেশে এরূপ একটি সংকটে জাতিগত দাঙ্গা শুরু হয়। এই দাঙ্গা একসময় গৃহযুদ্ধে রূপ নিলে সেখানে প্রচুর প্রাণহানি ঘটে। পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে সেখানে শান্তিমিশন পাঠালে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি ঘটে। অনেকের ধারণা সেখানে ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবীয় চেতনার অভাবে এ ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়।

ক. অরণ্যকে আরও সবুজ করবে কে?
খ. 'বার বার বিধ্বস্ত হবে না ট্রয়নগরী' –ব্যাখ্যা করুন।
গ. 'সেই অস্ত্র' কবিতায় উদ্দীপকের কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপক ও 'সেই অস্ত্র' কবিতায় ফুটে উঠেছে যুদ্ধবিরোধী চেতনা।" –মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক.

অরণ্যকে আরও সবুজ করবে ভালবাসা।

খ.

ভালোবাসা নামক অস্ত্র উত্তোলিত হলে যুদ্ধের নির্মমতায় ট্রয় নগরী আর বিধ্বস্ত হবে না।

পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষের হিংসা-বিদ্বেষ আর দম্ভের কারণে প্রাচীন তুরস্কের স্থাপত্যকলায় নন্দিত শহর ট্রয় নগরী বারবার ধ্বংসের শিকার হয়েছে। পৃথিবীতে নেমে এসেছে অশান্তি। একমাত্র ভালোবাসার মাধ্যমেই সম্ভব ট্রয় নগরীকে রক্ষা করা। অন্যকথায়, পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। তাই কবি আহসান হাবীব 'সেই অস্ত্র' কবিতায় পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে অমোঘ অস্ত্র 'ভালোবাসা'র কথা বলেছেন। বস্তুত মানুষ ভালোবাসার সন্ধান পেলে যুদ্ধে লিপ্ত হয় না। আর এ কারণে ট্রয় নগরীও বার বার বিধ্বস্ত হবে না।

গ.

উদ্দীপকে আফ্রিকার জাতিগত দাঙ্গায় 'সেই অস্ত্র' কবিতার আত্ম-অহমিকার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ভালোবাসা কেবল আবেগ বা অনুভূতির ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে না। এটি মানুষকে সকল অন্যায় ও অপকর্ম থেকে মুক্ত করে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। মানুষ যদি হিংসা, লোভ, ঈর্ষা থেকে বিরত হয়ে পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন করে তবে পৃথিবীতে বিরাজ করবে শান্তি এবং সমৃদ্ধি। আর তা করা সম্ভব একমাত্র ভালোবাসা নামক অস্ত্র দিয়ে। কবি আহসান হাবীব

'সেই অস্ত্র' কবিতায় মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসার জয়গান গেয়েছেন। তাঁর মতে ভালোবাসা নামের অমোঘ অস্ত্র উত্তোলিত হলে তা মানববিধ্বংসী অন্য সকল মারণাস্ত্রকে পরাস্ত করবে। ফলে পৃথিবীতে শান্তি নেমে আসবে। ভালোবাসার অভাবে মানুষের মধ্যে মানবিকতা লোপ পায় যার পরিণতিতে সে যুদ্ধের মতো অমানবিক কর্মকাণ্ডে যোগ দিতে পারে। তাই কবি মানুষকে ভালোবাসার সংস্পর্শে এনে মানুষকে সত্যিকার অর্থে পরিবর্তন করতে চেয়েছেন। কবি জানেন মানুষ হিংসা আর স্বার্থপরতার করালগ্রাসে নিপতিত হয়ে অনেক মানবিকতাশূন্য কাজ করে। কবি মানুষের সেই মানবিকতাবোধকে মানবসমাজে ফিরিয়ে দিতে চান। অন্যদিকে উদ্দীপকে দেখা যায়, আফ্রিকার জাতিগত দাঙ্গা গৃহযুদ্ধে রূপ নিলে সেখানে অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। অনেকের ধারণা সেখানে আর্থ-সামাজিক অন্য কারণ থাকলেও পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ ও সৌহার্দ্যের অভাবে এ ধরণের ঘটনা ঘটে। আফ্রিকার এ ঘটনাটিই 'সেই অস্ত্র' কবিতায় উপজীব্য হয়েছে। বস্তুত 'সেই অস্ত্র' কবিতায় জাতিগত হিংসা-বিদ্বেষ তথা জাত্যভিমান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, যা উদ্দীপকেও চিত্রিত হয়েছে।

ঘ.

"উদ্দীপক ও 'সেই অস্ত্র' কবিতায় যুদ্ধবিরোধী চেতনা প্রকাশিত হয়েছে।" –মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

কবি আহসান হাবীব ভালোবাসার শক্তিতে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। কেননা হিংসা ও বিদ্বেষের কারণে পৃথিবীতে মানুষ দিন দিন আরও কঠিন সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে। মানবীয় মূল্যবোধের অভাবে মানুষ একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আর অশুভ শক্তিগুলো পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করছে। এজন্য কবি ভালোবাসার মতো অমোঘ অস্ত্রের প্রত্যাশী হয়েছেন।

'সেই অস্ত্র' কবিতার কবি পৃথিবীতে ভালোবাসা নামের অমোঘ অস্ত্র পুনরায় মানবসমাজে ফিরে পেতে চেয়েছেন। ভালোবাসার সংস্পর্শে আসতে না পারার কারণেই পৃথিবীতে এত যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে। মানুষ ভালোবাসার স্পর্শ পায় না বলেই মানুষকে শত্রু ভাবছে। প্রসিদ্ধ ট্রয় নগরী যুদ্ধের শিকার হয়েছে বার বার। উদ্দীপকেও দেখা যায় আফ্রিকার একটি দেশে জাতিগত দাঙ্গা গৃহযুদ্ধে রূপ নিয়েছে। যুদ্ধের কারণে সেখানে অসংখ্য মানুষ মারা যায়। অনেকে মনে করছেন, সেখানে আর্থ-সামাজিক কারণের বাইরে মানুষের মনুষ্যত্ববোধ তথা ভ্রাতৃত্ববোধ ও সৌহার্দ্যের অভাবে এ ধরণের ঘটনা ঘটেছে।

'সেই অস্ত্র' কবিতায় মানুষে মানুষে যে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে তা গড়ে ওঠার প্রাথমিক শর্ত হলো ভ্রাতৃত্ববোধ, সৌহার্দ্য ও মানবতাবোধ যা উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে। ভালোবাসার অভাবেই হিংসা-দ্বেষ-ঘৃণা বৃদ্ধি পায়। একসময় তা উদ্দীপকের মতো মানুষের জাত্যভিমানের কারণে জাতিগত দাঙ্গার সৃষ্টি করে। কিন্তু উদ্দীপকের ও 'সেই অস্ত্র' কবিতার কবি চূড়ান্ত বিচারে শান্তির প্রত্যাশী। তাই বলা যায়, উদ্দীপক ও 'সেই অস্ত্র' কবিতায় যুদ্ধবিরোধী চেতনা প্রকাশিত হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

জল্লাদের শাণিত অস্ত্র
সভ্যতার নির্মল পুষ্পকে আহত করার পূর্বে
সঙ্গীত ও চিত্রকলাকে ধ্বংস করার পূর্বে
ছাড়পত্রহীন সূর্যকিরণকে বিষাক্ত করার পূর্বে
এসো, বারবারা, বজ্র হয়ে বিদ্ধ করি তাকে।

ক. ট্রয় নগরী কোথায়?
খ. 'লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে না পঙ্গু- বিকৃত' –ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকের ধ্বংসের চিত্রটি 'সেই অস্ত্র' কবিতায় কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপক ও 'সেই অস্ত্র' কবিতায় কবির হৃদয়ের প্রত্যাশা প্রশান্তি ।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. ক ৩. ঘ ৪. খ ৫. ক ৬. ক ৭. ক ৮. ক

আঠারো বছর বয়স

সুকান্ত ভট্টাচার্য

কবি-পরিচিতি

সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৯২৬ সালের ১৫ আগস্ট কলকাতায় এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়ার উনশিয়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য ও মায়ের নাম সুনীতি দেবী। সুকান্ত ভট্টাচার্য ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন মার্কসবাদী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ও প্রগতিশীল চেতনার অধিকারী একজন তরুণ কবি। সে-সময়ের দৈনিক পত্রিকা 'স্বাধীনতা'র কিশোরসভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সম্পাদক ছিলেন। তেতাল্লিশের মন্বন্তর, ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতির বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেছিলেন। তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে যাবতীয় অনাচার, বৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ। দরিদ্র ও নির্যাতিত মানুষের পক্ষে কথা বলার জন্য তিনি কবিতাকে হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। ছিন্নভিন্ন মানুষ, যারা অভাব-অনটন, রোগ-শোকে ধুঁকে বুকের মাত্র ক'খানা হাড় নিয়ে বেঁচে আছে অদম্য বাসনায়– সুকান্ত সেইসব গণমানুষের বন্ধু। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর কবিতা স্বাধীনতাকামী মানুষের মনে সাহস ও উদ্দীপনা জুগিয়েছে। সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৯৪৭ সালের ১৩ মে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে মাত্র একুশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

কাব্যগ্রন্থ : *ছাড়পত্র* (১৯৪৭), *ঘুম নেই* (১৯৫০), *পূর্বাভাস* (১৯৫০);
ছড়া : *মিঠেকড়া* (১৯৫২),
গীতিনাট্য : *অভিযান* (১৯৫৩), *সূর্য-প্রণাম* (১৯৫৩);
সংগীত : *গীতিগুচ্ছ* (১৯৬৫);
গল্পগ্রন্থ : *হরতাল* (১৯৬২)।

ভূমিকা

'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ছাড়পত্র' নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এ কবিতায় কবি নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যকে এবং আঠারো বছর বয়সের বিভিন্ন গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

উদ্দেশ্য

সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি পড়ার পর আপনি–

- কবিতার মূলভাবটি বুঝে লিখতে পারবেন।
- আঠারো বছর বয়সী তরুণদের মানসিক শক্তি ও চেতনাগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- 'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে'। –কবির এই প্রত্যাশার যৌক্তিকতা বিচার করতে পারবেন।

মূলপাঠ

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।

আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়–
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।

এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে,
প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।

আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর
তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা,
এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর
এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।

আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার
পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান,
দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার
ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্য প্রাণ।

আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত; একে একে হয় জড়ো,
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।

তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।

এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে
এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়–
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে ॥

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ– এ বয়স মানবজীবনের এক উত্তরণকালীন পর্যায়। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে মানুষ এ বয়সে। অন্যদের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিতে হয় তাকে। এদিন থেকে তাকে এক কঠিন সময়ের দুঃসহ অবস্থায় পড়তে হয়। **আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা–** যৌবনে পদার্পণ করে এ বয়সে মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী হয়। জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ায় স্বাধীনভাবে। শৈশব-কৈশোরের পরনির্ভরতার দিনগুলোতে যে কান্না ছিল এ বয়সের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য তাকে সচেতনভাবে মুছে ফেলতে উদ্যোগী হয়। **এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর–** অনুভূতির তীব্রতা ও সুগভীর সংবেদনশীলতা এ বয়সেই মানুষের জীবনে বিশেষ তীব্র হয়ে দেখা দেয় এবং মনোজগতে তার প্রতিক্রিয়াও হয় গভীর। **এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা–** ভালো-মন্দ, ইতিবাচক-নেতিবাচক নানা তত্ত্ব, মতবাদ, ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে এই বয়সের তরুণেরা। **এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য–** দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য যুগে যুগে এ বয়সের মানুষই এগিয়ে গেছে সবচেয়ে বেশি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়িয়েছে সমস্ত বিপদ মোকাবেলায়। প্রাণ দিয়েছে অজানাকে জানবার জন্য, দেশ ও জনগণের মুক্তি ও কল্যাণের সংগ্রামে। তাই এ বয়স সুন্দর, শুভ ও কল্যাণের জন্য রক্তমূল্য দিতে জানে। **এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে–** সচেতন ও সচেষ্ট হয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে জীবন পরিচালনা করতে না পারার অজস্র ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসে এ বয়স নেতিবাচক কালো অধ্যায় হয়ে উঠতে পারে। **এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে–** আঠারো বছর বয়স বহু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। জড় নিশ্চল প্রথাবদ্ধ জীবনকে পেছনে ফেলে নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন, কল্যাণ ও সেবাব্রত, উদ্দীপনা, সাহসিকতা, চলার দুর্বার গতি– এসবই আঠারো বছর বয়সের বৈশিষ্ট্য। কবি প্রার্থনা করেন, এসব বৈশিষ্ট্য যেন জাতীয় জীবনে চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়। **তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা–** চারপাশে অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, পীড়ন, সামাজিক বৈষম্য ও ভেদাভেদ ইত্যাদি দেখে প্রাণবন্ত তরুণেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। **দুর্যোগে হাল ঠিক মতো রাখা ভার–** জীবনের এই সন্ধিক্ষণে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক নানা জটিলতাকে অতিক্রম করতে হয়। এই সময় সচেতন ও সচেষ্টভাবে নিজেকে পরিচালনা করতে না পারলে পদস্খলন হতে পারে। জীবনে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। **বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি–** নানা দুঃসাহসী স্বপ্ন, কল্পনা ও উদ্যোগ এ বয়সের তরুণদের মনকে ঘিরে ধরে। **পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে–** এ বয়স দেহ ও মনের স্থবিরতা, নিশ্চলতা, জরাজীর্ণতাকে অতিক্রম করে দুর্বার গতিতে। প্রগতি ও অগ্রগতির পথে নিরন্তর ধাবমানতাই এ বয়সের বৈশিষ্ট্য। **সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে–** তারুণ্য স্বপ্ন দেখে নতুন জীবনের, নব নব অগ্রগতি সাধনের। তাই সেইসব স্বপ্ন বাস্তবায়নে, নিত্য-নতুন করণীয় সম্পাদনের জন্য নব নব শপথে বলীয়ান হয়ে তরুণ-প্রাণ এগিয়ে যায় দৃঢ় পদক্ষেপে। **স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি–** অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে মাথা উঁচু করে স্বাধীনভাবে চলার ঝুঁকি এ বয়সেই মানুষ নিয়ে থাকে।

সারসংক্ষেপ

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যকে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে তুলে ধরেছেন। আঠারো বছর বয়সে পদার্পণের মধ্য দিয়ে মানুষ যৌবনপ্রাপ্ত হয়। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের এ বয়সটি উত্তেজনার, প্রবল আবেগ ও উচ্ছ্বাসে জীবনে ঝুঁকি নেবার উপযোগী। অদম্য দুঃসাহসে সকল বাধা বিপদ অতিক্রম করে এরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত। আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া এ বয়সের ধর্ম। অদম্য মনোবল, অপ্রতিরোধ্য গতিতে তরুণ সমাজ দেশ ও জাতির প্রয়োজনে অকাতরে প্রাণ দিতে পারে। আমাদের কাছে তাই তারুণ্যই জীবন, তারুণ্যই কাঙ্ক্ষিত। কারণ সৃষ্টিধর্মী ও কল্যাণকর সব কিছু তরুণদেরই দান। তাই কবি প্রত্যাশা করেছেন নানা সমস্যাপীড়িত এ দেশে তারুণ্য ও যৌবনশক্তি যেন জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়। এ বয়সে নিজের চিন্তার চেয়ে সমাজের চিন্তা প্রবল, সমাজের উন্নতির জন্য প্রতিবাদী হয়ে ওঠে এ বয়সীরা, আবার সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধাচরণ করে এ বয়সেই। কবির আহ্বান, এ দেশের মাটি ও মানুষের চেতনা আঠারোকে ধারণ করুক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

ক. স্বরবৃত্ত　　খ. মাত্রাবৃত্ত
গ. অক্ষরবৃত্ত　　ঘ. স্বরমাত্রিক

২. আঠারো বছর বয়স কিসের প্রতীক?

ক. বিপদের　　খ. যৌবনের
গ. বেদনার　　ঘ. নিশ্চলতার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

স্বাধীনতার প্রত্যাশায় দেশে চলছে মুক্তিযুদ্ধ। আর এ সময় দেশ আশা করে সমস্ত তরুণের আঠারো বছর তার বুকে নেমে আসুক ।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে নিচের কোন চরণের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়　　খ. বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে
গ. এ বয়স নতুন কিছু করে　　ঘ. এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়

৪. উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় ফুটে উঠেছে–

ক. তারুণ্যের উদ্দীপনা　　খ. কল্যাণ চেতনা
গ. ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস　　ঘ. সৃষ্টিশীলতা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. আঠারো বছর বয়স–

i. দুঃসহ
ii. নির্ভয়
iii. দুর্বার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

৬. 'এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা' বলতে তারুণ্যের যে বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে–

ক. ইতি- নেতি নানা ভাবনাকে　　খ. দুর্বার গতিকে
গ. সেবাব্রতকে　　ঘ. নির্ভীকতাকে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার দুটি চরণ এ রকম–

'আমি দুর্বার
আমি ভেঙে করি সব চুরমার।'

৭. উদ্দীপকের কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে আপনার পঠিত কোন কবির সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. আল মাহমুদ　　খ. সুফিয়া কামাল
গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য　　ঘ. বিষ্ণু দে

৮. উদ্দীপকের কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–

ক. জন্মভূমি প্রীতি　　খ. নাগরিক জীবনবোধ
গ. সাহসী অভিযাত্রা　　ঘ. অন্যায়ের বিরুদ্ধে দ্রোহ

সৃজনশীল প্রশ্ন :

মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম
মোরা ঝরনার মতো চঞ্চল
মোরা বিধাতার মতো নির্ভয়
মোরা প্রকৃতির মতো উচ্ছল
মোরা আকাশের মতো বাঁধাহীন
মোরা মরু সঞ্চারী বেদুঈন।

ক. 'রক্তদান' কী কাজ?
খ. 'শপথের কোলাহল' বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মর্মবাণী প্রকাশিত হয়েছে।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক.
রক্তদান পুণ্যের কাজ।

খ.
'শপথের কোলাহল' শব্দগুচ্ছ দ্বারা মানব জীবনে প্রতিজ্ঞার গাঢ়তাকে বোঝানো হয়েছে।

আঠারো বছর বয়স মিথ্যা ও অপশক্তির সামনে নির্ভীক চিত্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু যারা ভীরু তারা লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে আবার পিছু হটে যায়। আঠারো বছর বয়সের তারুণ্য একবার যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে তারা সে উদ্দেশ্য কখনোই বিসর্জন দেয় না। দুরন্ত শক্তি আর দুর্বার সাহস নিয়ে সে তার লক্ষ্য বাস্তবায়নে সর্বদা উদগ্রীব থাকে। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'শপথের কোলাহল' বলতে কবি তারুণ্যের এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের দুর্বার মানসিকতাকে বুঝিয়েছেন।

গ.
উদ্দীপকের সঙ্গে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার নবীনদের অদম্য প্রাণশক্তি আর তরুণ চিত্তের দুর্বার গতির দিক থেকে সাদৃশ্য রয়েছে।

আঠারো বছর বয়স অদম্য প্রাণশক্তি আর উদ্দীপনায় ভরা থাকে। নানা দুঃসাহসী স্বপ্ন, কল্পনা ও উদ্যোগ এ সময় শরীর ও মনে যৌবনের মাদকতায় ভর করে। এ সময় মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াবার ঝুঁকি গ্রহণ করে। বদ্ধ চিন্তা এবং জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার অভিপ্রায়ে তারা নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে। নবীনদের ধর্মই হলো নিজেকে নিবেদন করে দুর্বার বেগে প্রগতির পথে এগিয়ে চলা।

উদ্দীপকে নবীনদের অফুরন্ত প্রাণশক্তি প্রকাশিত হয়েছে। তারা স্বপ্ন দেখে নতুন জীবনের, সভ্যতার নব নব অগ্রগতি সাধনের। এসব স্বপ্ন বাস্তবায়নে তারা দৃঢ় পদক্ষেপে নতুন শপথে বলীয়ান হয়ে ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম গতিতে এগিয়ে চলে। এই নবীনরা আকাশের মতো বাঁধাহীন, তারা মরু সঞ্চারী বেদুঈন। তাদের দুর্বার গতির সামনে কোনো প্রতিবন্ধতকতা সৃষ্টি হতে পারে না। এই নবীনরা মানুষের কল্যাণে স্বাধীনভাবে এগিয়ে চলার ঝুঁকি নেয়। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায়ও বর্ণিত হয়েছে যৌবনই মানুষের জীবনে শ্রেষ্ঠ সময়। এ বয়স কোনো বাধার কাছে মাথা নত করে না। এ সময় মানুষ সব বাধা-বিঘ্ন দুমড়ে মুচড়ে এগিয়ে চলে সামনের দিকে। যৌবন স্বপ্ন দেখে বিশ্ব জয়ের। উদ্দীপকের সঙ্গে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি এভাবেই সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ঘ.
'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় বর্ণিত যৌবনের স্বরূপ উদ্দীপকেও ফুটে উঠেছে– মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

আঠারো বছর বয়স তারুণ্যের বয়স, যৌবনের বয়স। এ বয়সে বুকের ভেতর বাসা বাঁধে যত রকমের দুরন্তপনা আর নব নব ইচ্ছা। মানুষ স্বাধীনভাবে চলার ঝুঁকি নেয় এ বয়সেই। এ বয়সে আছে সব দুর্যোগ আর দুর্বিপাক মোকাবেলা করার অফুরন্ত প্রাণশক্তি। ফলে তারুণ্য এগিয়ে যায় দুর্বার গতিতে নব সভ্যতার পানে।

উদ্দীপকে তরুণ প্রাণের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। এই নবীন তরুণদের দুরন্তপনায় সৃষ্টি হয় স্বপ্নের নতুন সমাজ। আরবের যাযাবর বেদুঈনদের দাপটে যেমন ঊষর মরুও বশীভূত হয়, সেখানে প্রকৃতি যেমন বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তেমনি তারুণ্যও রক্তশপথ নিয়ে সব বিপত্তি এড়িয়ে এগিয়ে চলে। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায়ও যৌবনের এই প্রশস্তি গাওয়া হয়েছে। কবিতায় যৌবন নির্ভীক, উদ্দাম, চঞ্চল এবং আকাশের মতো বন্ধনহীন। মানুষের কল্যাণে নির্ভীক চিত্তে এগিয়ে যাওয়াই যৌবনের ধর্ম।

উদ্দীপক এবং 'আঠারো বছর বয়স' কবিতা উভয়টিতে নবীন এবং তারুণ্যের প্রাণধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। প্রগতি এবং সভ্যতার পথে নিরন্তর অভিযাত্রা দুইয়েরই মূল কথা। উদ্দীপকের নবীনরা যেমন অশুভ শক্তির বিনাশ সাধন করে সত্য আর সুন্দরের বারতা আনতে আগ্রহী তেমনি কবিতার যৌবনও পৃথিবীতে শান্তির বারতা বইয়ে দিতে উৎসুক। বস্তুত বিশ্বকে সুন্দর ও সত্যের পথে পরিচালিত করতে যে যৌবন ধর্মের বিকল্প নেই সে সত্যটি প্রকাশিত হয়েছে উদ্দীপকে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটিতে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মর্মবাণী প্রকাশিত হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন
হেরিব না দিক–
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার
উদ্দাম পথিক।

ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন?
খ. 'এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা' –ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার যে বিষয়ে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তা তুলে ধরুন।
ঘ. "উদ্দীপকে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মূলভাব অনুরণিত হয়েছে।" –স্বীকার করেন কি? যুক্তিসহ আপনার মতামত তুলে ধরুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. খ ৩. ক ৪. ক ৫. ঘ ৬. ক ৭. গ ৮. গ

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শামসুর রাহমান

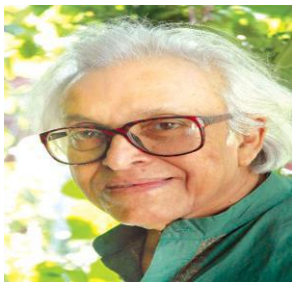

কবি-পরিচিতি

শামসুর রাহমান ১৯২৯ সালের ২৪ অক্টোবর ঢাকা শহরে তাঁর নানাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার পাড়াতলী গ্রাম। তাঁর পিতা মোখলেসুর রহমান চৌধুরী ও মাতা আমেনা খাতুন। শামসুর রাহমান তাঁর তেরো ভাই-বোনের মধ্যে চতুর্থ। তিনি ১৯৪৫ সালে ঢাকার পোগোজ ইংলিশ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে আইএ পাশ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হয়েও চূড়ান্ত পরীক্ষা না দিয়ে পাস কোর্সে বিএ পাশ করেন। তাঁর পেশা ছিল সাংবাদিকতা। ১৯৫৭ সালে 'দৈনিক মর্নিং নিউজ'-এ সাংবাদিকতা দিয়ে শুরু এবং ১৯৬৪ সালে 'দৈনিক পাকিস্তান' (পরে 'দৈনিক বাংলা')-এ যোগ দিয়ে ১৯৮৭ সালে প্রধান সম্পাদক থেকে পদত্যাগ। আঠারো বছর বয়সে তিনি লেখালেখি শুরু করেন। ১৯৫৮ সালে স্বৈরশাসক আইয়ুব খানকে বিদ্রূপ করে 'হাতির শুঁড়' নামক কবিতা লিখে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। দেশ, দেশের মানুষ, স্বাধীনতা আর মাতৃভাষাকে নিয়ে তাঁর রচিত কবিতাগুলো ইতিহাস হয়ে থাকবে। তাঁর 'বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', 'স্বাধীনতা তুমি', 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা', 'সফেদ পাঞ্জাবি', 'আসাদের শার্ট' প্রভৃতি কবিতায় উঠে এসেছে বাঙালি জাতির স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ। বিষয়ে, আঙ্গিকে, উপস্থাপনায় তাঁর কবিতা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের প্রত্যাশা, হতাশা, বিচ্ছিন্নতা, বৈরাগ্য ও সংগ্রাম তাঁর কবিতায় সার্থকভাবে বিধৃত। উপমা ও চিত্রকল্পে তিনি প্রকৃতিনির্ভর এবং বিষয় ও উপাদানে শহরকেন্দ্রিক। বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে দুই বাংলায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও জনপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠিত। ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিলিট উপাধিতে ভূষিত করে। এছাড়া তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক ও স্বাধীনতা পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০০৬ সালের ১৭ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শামসুর রাহমানের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

কাব্যগ্রন্থ : প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৯৬০), রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৩), বিধ্বস্ত নীলিমা (১৯৬৭), নিরালোকে দিব্যরথ (১৯৬৮), নিজ বাসভূমে (১৯৭০), বন্দি শিবির থেকে (১৯৭২), ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা (১৯৭৪), উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ (১৯৮২), বুক তার বাংলাদেশের হৃদয় (১৯৮৮);

শিশুতোষ : *এলাটিং বেলাটিং* (১৯৭৫), *ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো* (১৯৭৭), *স্মৃতির শহর* (১৯৭৯)।

ভূমিকা

শামসুর রাহমান রচিত 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' শীর্ষক কবিতাটি *নিজ বাসভূমে* কাব্যগ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। গদ্যছন্দ ও প্রবাহমান ভাষার সুষ্ঠু বিকাশে কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সংযোজন। কবিতাটিতে গণজাগরণ, সংগ্রামী চেতনা ও দেশপ্রেমের প্রতিফলন ঘটেছে। কবিতাটিতে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনে সকল শ্রেণি পেশার মানুষের অবদান ফুটে উঠেছে।

উদ্দেশ্য

শামসুর রাহমানের 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি পড়ার পর আপনি–

- কবির দেশাত্মবোধক চেতনা বর্ণনা করতে পারবেন।
- এ দেশের সংগ্রামী মানুষের আত্মত্যাগের কথা আলোচনা করতে পারবেন।
- বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন ও উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের চেতনাগত ঐক্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে
কেমন নিবিড় হয়ে। কখনো মিছিলে কখনো-বা
একা হেঁটে যেতে যেতে মনে হয়– ফুল নয়, ওরা
শহিদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর।
একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রং।
এ–রঙের বিপরীত আছে অন্য রং,
যে-রং লাগে না ভালো চোখে, যে-রং সন্ত্রাস আনে
প্রাত্যহিকতায় আমাদের মনে সকাল-সন্ধ্যায়–
এখন সে রঙে ছেয়ে গেছে পথ-ঘাট, সারা দেশ
ঘাতকের অশুভ আস্তানা।
আমি আর আমার মতোই বহু লোক
রাত্রি-দিন ভূলুণ্ঠিত ঘাতকের আস্তানায়, কেউ মরা, আধমরা কেউ,
কেউ বা ভীষণ জেদি, দারুণ বিপ্লবে ফেটে পড়া। চতুর্দিকে
মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ।
বুঝি তাই উনিশশো উনসত্তরেও
আবার সালাম নামে রাজপথে, শূন্যে তোলে ফ্ল্যাগ,
বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে।
সালামের চোখে আজ আলোচিত ঢাকা,
সালামের মুখে আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা।
দেখলাম রাজপথে, দেখলাম আমরা সবাই
জনসাধারণ
দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো
ঝরে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা
আর বরকত বলে গাঢ় উচ্চারণে
এখনো বীরের রক্তে দুঃখিনী মাতার অশ্রুজলে
ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চত্বরে
হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায় সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ,
শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে আর দুঃখের ছায়ায়।

[সংক্ষেপিত]

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

আস্তানা– আখড়া, আশ্রম। **আবার ফুটেছে দ্যাখো...আমাদের চেতনারই রং–** প্রতি বছর শহরের পথে পথে কৃষ্ণচূড়া ফুল ফোটে। কবির মনে হয় যেন ভাষা শহিদদের রক্তের বুদ্বুদ কৃষ্ণচূড়া ফুল হয়ে ফুটেছে। তাই একুশের কৃষ্ণচূড়াকে কবি আমাদের চেতনার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চান। ভাষার জন্য যাঁরা রক্ত দিয়েছেন, জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের ত্যাগ আর মহিমা যেন মূর্ত হয়ে ওঠে থরে থরে ফুটে থাকা লাল কৃষ্ণচূড়ার স্তবকে-স্তবকে। **উপত্যকা–** দুই পর্বতের মাঝখানের

নিচু সমতল ভূমি। **কমলবন–** কবি মানবিকতা, সুন্দর ও কল্যাণের জগৎ বোঝাতে 'কমলবন' প্রতীকটি ব্যবহার করেছেন। **চর্যাপদ–** বাংলাভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন। **ফানুস–** বেলুন যা বাষ্পের সাহায্যে আকাশে উড়তে পারে। **বুঝি তাই উনিশশো...থাবার সম্মুখে–** ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের ক্রমধারায় ছাত্র-অসন্তোষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলন উনিশশো উনসত্তরে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। শহর ও গ্রামের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ছয় দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই আন্দোলন ছিল অপ্রতিরোধ্য। এই আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন আসাদুজ্জামান, মতিউর, ড. শামসুজ্জোহা প্রমুখ। এ অংশে কবি শোষণ আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও আত্মাহুতি দেওয়া বীর জনতাকে ভাষা-শহিদ সালাম ও বরকতের প্রতীকে তাৎপর্যময় করে তুলেছেন। **মানবিক বাগান–** মানবিক জগৎ। মনুষ্যত্ব, ন্যায় ও মঙ্গলের জগৎ। **মৈত্রী–** মিত্রতা, বন্ধুত্ব। **শাসনতন্ত্র–** শাসনপদ্ধতি, রাষ্ট্রশাসন প্রণালি। **শিহরিত–** কম্পিত, শিউরে, উঠেছে এমন। **সহচর–** সাথি, সঙ্গী। **হরিৎ–** সবুজ।

সারসংক্ষেপ

কবি শামসুর রাহমানের 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' সংগ্রামী চেতনা, দেশপ্রেম ও গণজাগরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করার মতো একটি কবিতা। ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানিদের শাসন, শোষণ, নিপীড়নের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলন ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। এদেশের সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ঢাকার রাজপথে জনগণের ঢল নামে। এ কাতারে সামিল হয় গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষ, কলকারখানার শ্রমিক, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শ্রেণিপেশার মানুষ। কবি এ কবিতায় পরম মমতায়, শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় সকল মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনাকে শৈল্পিক রূপ দিয়েছেন। এই আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে আসাদুজ্জামান, মতিউর, ড. শামসুজ্জোহা প্রমুখের মৃত্যুকে ভাষা-শহিদ সালাম ও বরকতের প্রতীকে তাৎপর্যময় করে তুলেছেন। কবি ভাষা-শহিদদের রক্তের বুদ্বুদকে কৃষ্ণচূড়া ফুলের সাথে তুলনা করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নাগরিক কবি কে?

ক. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ　　খ. আল মাহমুদ
গ. শামসুর রাহমান　　ঘ. নির্মলেন্দু গুণ

২. একুশের 'কৃষ্ণচূড়া' বাঙালির কিসের প্রতীক?

ক. চেতনার　　খ. স্বপ্নের
গ. রক্তের　　ঘ. বেদনার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বীরের মতো রুখে দাঁড়ায় বিজলী হয়ে ছোটে
মারের চোটে বর্গীরা সব ধুলো কাদায় লোটে।

৩. উদ্দীপকের বর্গীরা 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. শোষক　　খ. মেঘনার মাঝি
গ. ঘাতক　　ঘ. সংগ্রামী জনতা

৪. উদ্দীপক ও 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় যে ভাবটি ফুটে উঠেছে–

i. সংগ্রাম
ii. বঞ্চনা
iii. মহামারী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?

ক. নিরালোকে দিব্যরথ
খ. বিধ্বস্ত নীলিমা
গ. নিজ বাসভূমে
ঘ. বন্দি শিবির থেকে

৬. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় 'মানবিক বাগান' বলতে বোঝানো হয়েছে–

ক. মানবিক জগৎ
খ. মনোহর বাগান
গ. মানুষের বাগান
ঘ. কল্যাণের জগৎ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।

৭. উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?

ক. স্বাধীনতা সংগ্রাম
খ. ভাষা আন্দোলন
গ. গণ অভ্যুত্থান
ঘ. ছয় দফা আন্দোলন

৮. উদ্দীপক ও 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে–

i. শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা
ii. কৃষ্ণচূড়া বন্দনা
iii. সংগ্রামী চেতনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা।
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।

ক. 'কমলবন' প্রতীকটি কেন ব্যবহার করা হয়েছে?
খ. 'আবার সালাম নামবে রাজপথে' –উক্তিটি বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কোন বিষয়টি উঠে এসেছে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় বাঙালির সংগ্রামী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে।" –উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক.

কবি মানবিকতা, সুন্দর ও কল্যাণের জগৎ বোঝাতে 'কমলবন' প্রতীকটি ব্যবহার করেছেন।

খ.

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কবি ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে রক্তঝরা বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলনকে স্মরণ করেছেন সালামের মাধ্যমে।

ভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৪৮ সালে গড়ে উঠা ছাত্র- আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে সালাম, বরকত, রফিকসহ আরো অনেকে শহিদ হয়েছিলেন। মাতৃভাষার জন্য এঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানেও তাদের ন্যায় অনেক তাজাপ্রাণ তরুণ রাজপথে নেমেছিল প্রতিবাদের ঝাণ্ডা তুলে ধরতে। কবির নিকট এই তাজা প্রাণ তরুণদেরকে সালামের মতোই মনে হয়েছে। তাই কবি বলেছেন, 'আবার সালাম নামবে রাজপথে।'

গ.

উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিবতার প্রতিবাদী চেতনার বিষয়টি উঠে এসেছে।

মানুষ যখন অস্তিত্ব সংকটে পতিত হয় তখন তা রক্ষার বিষয়টি সামনে চলে আসে। এ সময় সে আর কোন অন্যায়-অত্যাচারকে মাথা পেতে নেয় না। সঙ্গতকারণেই সে সোচ্চার হয়ে উঠে সমস্ত অন্যায় এবং নির্মমতার বিরুদ্ধে। উদ্দীপক এবং 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কবির চেতনায় এই বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে একটি বৈরি সময়ে জাতির সংকটময় অবস্থাকে তুলে ধরা হয়েছে। যখন সবাই ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে, তখন ফুল নিয়ে খেলা করবার আর সময় নেই। কথাটির মধ্য দিয়ে কবি একটি বিরূপ সময়ের ছবির ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায়ও আমরা এমন একটি বিরূপ সময়ের চিত্র দেখি। যখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালির ভাষা- সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে, তখন নিশ্চিন্তে, নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকা সম্ভব হয়নি বাঙালির পক্ষে। বাঙালিকে অচিরেই নেমে আসতে হয় রাজপথে। তারা জেনে যায়, অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে সংগ্রাম করতে হবে, অধিকার আদায়ে সচেতন হতে হবে। বস্তুত 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার বিরূপ সময়টিই উদ্দীপকে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

ঘ.

উদ্দীপক ও 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি আমাদের সমাজ বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে, উভয় ক্ষেত্রেই আমরা এর প্রবল উপস্থিতি লক্ষ করি।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি বাংলার ইতিহাসের ঊনসত্তর কালপর্বের এক শিল্পভাষ্য। এ সময়ে জাতিগত শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এ দেশের সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। সারাদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ জড়ো হয় ঢাকার রাজপথ ও শহিদ মিনারের পাদদেশে। কবি শামসুর রাহমান পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার অসাধারণ এক ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন এ কবিতায়।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কবি ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতিচারণ করেছেন। এ আন্দোলনের পটভূমিতে ছিল অগণিত মানুষের সংগ্রামী চেতনা। পূর্ববাংলার মানুষ ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যের কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বলাবাহুল্য যে, পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলার মানুষ নানাভাবে পাকিস্তানি শাসকচক্রের দ্বারা নিপীড়নের শিকার হয়েছিল। ফলে ১৯৬৯ সালে এদেশের মানুষ গণ-আন্দোলনের ডাক দেয়। যার সফল পরিণতি ঘটে এক গণ-অভ্যুত্থানে। উদ্দীপকেও একটি সমাজের অস্থিরতার চিত্র ফুটে উঠেছে যা কোনোক্রমেই সুখকর নয়। বেঁচে থাকার জন্য সুকুমার জীবনের যে স্বপ্ন তা এখানে সুদূর পরাহত। এখানে মানুষের গায়ের চামড়া কাঠফাটা রোদ সেঁকে। উদ্দীপকে ফুল নিয়ে খেলার দিন নয় বলার মধ্য দিয়ে কবি সবাইকে প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়েছেন।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় উঠে এসেছে নষ্ট সময়ের আলেখ্য। সেখানে বাঙালির মুখের ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছে একটি সামন্তবাদী অপশক্তি। নির্বিচার হত্যা এবং অন্যায়-অত্যাচার দ্বারা সামন্তবাদী অপশক্তি মানুষের বেঁচে থাকার স্বাভাবিক অধিকারকেও নষ্ট করে দিতে চায়। ফলে বাঙালি হয়ে ওঠে প্রতিবাদী। আর উদ্দীপকেও কবি প্রতিবাদের মাধ্যমে দাবি-দাওয়াকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। প্রিয় ফুলকে নিয়ে খেলার আকাঙ্ক্ষা পরিহার করেছেন। তাই বলা যায়, 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় বাঙালির সংগ্রামী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাংক এলো
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে,
তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা
ছাত্রাবাস বস্তি উজাড় হলো।

ক. আমাদের চেতনার রঙ কী?
খ. 'ঘাতকের অশুভ আস্তানা' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার সাদৃশ্যগুলো তুলে ধরুন।
ঘ. "উদ্দীপক ও 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার মূলসুর একই প্রেরণা হতে উৎসারিত।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. ক ৩. ক ৪. ক ৫. গ ৬. ঘ ৭. খ ৮. ক

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

কবি-পরিচিতি

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ১৯৩৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জের বহেরচর-ক্ষুদ্রকাঠি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আব্দুল জব্বার খান ছিলেন প্রথমে হাইকোর্টের বিচারপতি ও পরে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পিকার এবং মা সালেহা খাতুন ছিলেন গৃহিণী। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে মাধ্যমিক, ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে বিএ (অনার্স), এমএ পাশ করে একই বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। পরে সিএসপি কর্মকর্তা হয়ে ১৯৮২ সালে সচিব হিসেবে অবসর নেন এবং বাংলাদেশ সরকারের কৃষি ও পানিসম্পদ মন্ত্রী হন। ১৯৮৪ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পঞ্চাশ দশকের অন্যতম কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে তাঁর কবিতার বিকাশ এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের আশা-নিরাশা ও স্বপ্ন-বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে তাঁর কবিতার পরিণতি। এছাড়া লোকজ ঐতিহ্যের ব্যবহার করে ছড়ার আঙ্গিকে তিনি কবিতা লিখেছেন। প্রকৃতির রূপ ও রঙের বিচিত্র ছবি তাঁর কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছে। ইংরেজি ভাষায়ও তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ১৯৭৯ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও ১৯৮৫ সালে একুশে পদক প্রাপ্ত হন। ২০০১ সালের ১৯ মার্চ তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ :

কাব্যগ্রন্থ : *সাত নরী হার* (১৯৫৫), *কখনো রং কখনো সুর* (১৯৭০), কমলের চোখ (১৯৭৪) *আমি কিংবদন্তির কথা বলছি* (১৯৮১), *বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা* (১৯৮৩), *আমার সময়* (১৯৮৭), *আমার সকল কথা* (১৯৯৩), *মসৃণ কৃষ্ণ গোলাপ* (২০০২);

ভূমিকা

কবিতাটি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর *আমি কিংবদন্তির কথা বলছি* কাব্যগ্রন্থের নামকবিতা। কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত। কবিতাটিতে বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস, সংগ্রাম, বিজয় এবং মানবিক উদ্ভাসনের অনিন্দ্য অনুষঙ্গসমূহ ফুটে উঠেছে। এই কবিতায় কবি মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটি পড়ার পর আপনি–

- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের সংগ্রাম ও বিজয়ের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- 'কবিতা' কীভাবে কবির প্রত্যাশিত মুক্তির প্রতীক হয়ে উঠলো, তা বুঝতে পারবেন।
- 'কিংবদন্তি' শব্দটি কীভাবে আমাদের ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে উঠলো, তা বুঝতে পারবেন।
- বাংলার ভূমিজীবী অনার্য ক্রীতদাসের লড়াই করে টিকে থাকার কথা ব্যক্ত করতে পারবেন।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ার পর আপনি–

- 'কিংবদন্তি' শব্দটির অর্থ জানাসহ বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- কবিতা আমাদের সংগ্রামী জবিনকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল
তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল।
তিনি অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন
অরণ্য এবং শ্বাপদের কথা বলতেন
পতিত জমি আবাদের কথা বলতেন
তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।
জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা
কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা।

যে কবিতা শুনতে জানে না
সে ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে।
আমি উচ্চারিত সত্যের মতো
স্বপ্নের কথা বলছি।
উনোনের আগুনে আলোকিত
একটি উজ্জ্বল জানালার কথা বলছি।
আমি আমার মায়ের কথা বলছি,
তিনি বলতেন প্রবহমাণ নদী
যে সাঁতার জানে না তাকেও ভাসিয়ে রাখে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে নদীতে ভাসতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মাছের সঙ্গে খেলা করতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না

সে মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না।

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
আমি বিচলিত স্নেহের কথা বলছি
গর্ভবতী বোনের মৃত্যুর কথা বলছি
আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

উনোনের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালা– আগুনে সবকিছু শুচি হয়ে ওঠে। তাই আগুনের উত্তাপে পরিশুদ্ধ হয়ে সকল গ্লানি মুছে ফেলে আলোয় ভরা মুক্তজীবনের প্রত্যাশা জানাতে উজ্জ্বল জানালার অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। **কিংবদন্তি–** জনশ্রুতি। লোকপরম্পরায় শ্রুত ও কথিত বিষয় যা একটি জাতির ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী। **পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত–** মানুষের ওপর অত্যাচারের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এখানে। সেই অত্যাচারের আঘাত যে এখনও তাজা রয়েছে তা বোঝাতেই রক্তজবার প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। আরও লক্ষণীয়, আঘাত রয়েছে পিঠে। অর্থাৎ, শত্রুরা ভীরু কাপুরুষের মতো পিছন থেকে আক্রমণ করেছে কিংবা বন্দি ক্রীতদাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, মুক্তমানুষের সঙ্গে সম্মুখ লড়াইয়ে বীরোচিত সাহস দেখায়নি। **বিচলিত স্নেহ–** আপনজনের উৎকণ্ঠা। মুক্তিপ্রত্যাশী মানুষের আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় তাদের স্বজনরা উদ্বিগ্ন হন। ভালোবাসা আর শঙ্কা একসঙ্গে মিশে যায়। **শ্বাপদ–** হিংস্র মাংসাশী শিকারি জন্তু।

সারসংক্ষেপ

'কিংবদন্তি' শব্দটি দ্বারা লোকপরম্পরায় শ্রুত ও কথিত এমন কোনো বিষয় বুঝায়, যা একটি জাতির ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটিতে কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ঐতিহ্যসচেতন শিকড়সন্ধানী মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির ঘোষণা দিয়েছেন। বাঙালি জাতির হাজার বছরের সংগ্রাম ও বিজয়ের ইতিহাস এ কবিতার প্রেক্ষাপট তৈরিতে উদ্দীপক হিসেবে কাজ করেছে। এ কবিতায় কবি মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁর পূর্বপুরুষের সাহসী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা বলেছেন। শত্রুরা কীভাবে ভীরু কাপুরুষের মতো পেছন থেকে আক্রমণ করে বা বন্দি ক্রীতদাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তা কবি তুলে ধরেছেন। কবি মাটির কাছাকাছি মানুষের ইতিহাসের সঙ্গে বাংলার ভূমিজীবী অনার্য-ক্রীতদাসের লড়াই করে টিকে থাকার ইতিহাস তুলে ধরেছেন। তিনি কবি ও কবিতার কথা বলেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কে 'কিংবদন্তির কথা' বলেছেন?

ক. আহসান কবির　　খ. আহসান হাবীব
গ. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ　　ঘ. আবু জাফর শামসুদ্দিন

২. 'শ্বাপদ' বলতে বোঝায়–

ক. ইস্পাতের তরবারী　　খ. মৎস্য কন্যা
গ. হিংস্র মাংসাশী প্রাণী　　ঘ. শস্যের সম্ভার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আমিতো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে
আমিতো এসেছি পালযুগ নামে চিত্রকলা থেকে।

৩. উদ্দীপকে কবিতার যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে–

ক. প্রকৃতিচেতনা　　খ. ঐতিহ্যচেতনা
গ. ইতিহাসচেতনা　　ঘ. ভূগোলচেতনা

৪. উদ্দীপক এবং 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে–

i. ধর্মীয় সত্তা
ii. জাতীয় সত্তা
iii. সাংস্কৃতিক সত্তা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. ii ও iii

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ার পর আপনি–

- কবি কীভাবে কবিতা ও সত্যের অভেদ কল্পনায় সচেষ্ট ছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন চিত্রকল্পের মাধ্যমে কবি কীভাবে ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়াতীতের দ্যোতনা সৃষ্টি করেছেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- 'সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান' ঘটাতে কবিতার সচেতন প্রয়াস সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়
যুদ্ধ আসে ভালোবেসে
মায়ের ছেলেরা চলে যায়,
আমি আমার ভাইয়ের কথা বলছি।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে সন্তানের জন্য মরতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখতে পারে না।
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল
কারণ তিনি ক্রীতদাস ছিলেন।
যে কর্ষণ করে
শস্যের সম্ভার তাকে সমৃদ্ধ করবে।
যে মৎস্য লালন করে
প্রবহমাণ নদী তাকে পুরস্কৃত করবে।
যে গাভীর পরিচর্যা করে

জননীর আশীর্বাদ তাকে দীর্ঘায়ু করবে।
যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে
ইস্পাতের তরবারি তাকে সশস্ত্র করবে।
দীর্ঘদেহ পুত্রগণ
আমি তোমাদের বলছি।
আমি আমার মায়ের কথা বলছি
বোনের মৃত্যুর কথা বলছি
ভাইয়ের যুদ্ধের কথা বলছি
আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি।

আমি কবি এবং কবিতার কথা বলছি।
সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা
সুপুরুষ ভালোবাসার সুকণ্ঠ সংগীত কবিতা
জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা
রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ কবিতা।
আমরা কি তাঁর মতো কবিতার কথা বলতে পারবো
আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

ক্রীতদাস– কেনা গোলাম। **পূর্বপুরুষ–** কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন সংকট অতিক্রমকারী জাতির পূর্বগামী সন্তানদের বুঝিয়েছেন। **মায়ের ছেলেরা চলে যায়–** দেশের ক্রান্তিকালে দেশ মাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করতে মায়ের ছেলেরা যুদ্ধে যায়। **সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখা–** সূর্য সকল শক্তির উৎস। তাই এই সর্বশক্তির আধারকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারলে মুক্তি অনিবার্য। কবির মতে, এই সামর্থ্য অর্জনের একমাত্র উপায় হলো কবিতা শোনা; কবিতাকে আত্মস্থ করা। কেননা, কবির কাছে শুধু কবিতাই সত্য আর সত্যই শক্তি।

সারসংক্ষেপ

কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ 'কবিতা' ও সত্যের অভেদ কল্পনার মাধ্যমে মায়ের কথা, বোনের কথা, ভাইয়ের কথা বলেন। তাঁর বিশ্বাস যুদ্ধই মুক্তি আনতে পারে। যুদ্ধ শুরু হলে মানুষকে পরিবার থেকে দূরে যেতে হয়, ভালোবাসার মানুষকে মুক্ত করতে তাদের ছেড়ে যেতে হয়। এ সত্য আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত।
কবি 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' এবং 'যে কবিতা শুনতে জানে না' পঙ্‌ক্তিমালার মাধ্যমে কবিতা আর মুক্তির আবেগকে একত্রে শিল্পরূপ দিয়েছেন। এ কবিতায় কবি একাধিক চিত্রকল্পের মাধ্যমে [যেমন, "কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা"] ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়াতীতের দ্যোতনা সৃষ্টি করেছেন। কবির বিশ্বাস, যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত এ দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এ-দেশের দামাল ছেলেরা। তাদের পরিশ্রমের ফসল হিসেবে সাফল্য আসবেই। কবিতাই পারে সেই সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান ঘটাতে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. যে কবিতা শোনে না সে সন্তানের জন্য কী করতে পারে না?

ক. লড়তে
খ. মরতে
গ. ত্যাগ
ঘ. আশীর্বাদ

৬. কবি কেন তাঁর পূর্বপুরুষের কথা বলেছেন?

ক. উচ্চ বংশমর্যাদা ছিল বলে
খ. নিপীড়িত হয়েছে বলে
গ. সংস্কৃতিচর্চা করত বলে
ঘ. গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে বলে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

জাহানারা ইমামের বড় ছেলে রুমি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অভূতপূর্ব দেশপ্রেম তাকে মায়ের কোল ত্যাগ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

৭. উদ্দীপকের চরিত্রটির সঙ্গে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কার সঙ্গে মিল রয়েছে?

ক. নূরুলদীন
খ. কবি
গ. আনোয়ার
ঘ. কলিম

৮. উদ্দীপক ও 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে–

i. শঙ্কা
ii. করুণা
iii. ভালবাসা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও ii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. কবির পূর্বপুরুষের করতলে কিসের সৌরভ ছিল?

ক. পলিমাটির
খ. শস্যদানার
গ. মৎস্যকন্যার
ঘ. রক্তজবার

১০. কবি কেন 'বিচলিত স্নেহে'র কথা বলেছেন?

ক. শঙ্কায়
খ. বিপদে
গ. ভালবাসায়
ঘ. কল্পনায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

'স্মৃতিস্তম্ভ' কবিতায় বর্ণিত হয়েছে মাটির কাছাকাছি মানুষের ইতিহাস। এই ইতিহাস বাংলার ভূমিকেন্দ্রিক অনার্য ক্রীতদাসদের লড়াই করে টিকে থাকার ইতিহাস।

১১. উদ্দীপকের সঙ্গে আপনার পঠিত কোন কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে–

ক. বঙ্গভাষা
খ. সাম্যবাদী
গ. আমি কিংদন্তির কথা বলছি
ঘ. আঠারো বছর বয়স

১২. এরূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় যে বিষয়ে–

i. বাঙালির ইতিহাসে
ii. লড়াইয়ে
iii. বিজয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

স্বাধীনতা তুমি
ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্য পুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।

ক. প্রবহমাণ নদী কাকে ভাসিয়ে রাখে?

খ. পূর্বপুরুষদের কেন ক্রীতদাস বলা হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার সঙ্গে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. 'স্বাধীনতায় আনন্দময় মুক্ত জীবনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।' –উদ্দীপক ও 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :

৯ অক্টোবর চলে গেল চে'র প্রয়াণ দিবস। চে গুয়েভারার নাম শুনলেই চোখে ভাসে এক রোমান্টিক বিপ্লবীর অবয়ব। সারা বিশ্বের শোষিত, নিপীড়িত ও মুক্তিকামী মানুষের প্রদীপ্ত প্রতীক তিনি। সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের কাছেও সমানভাবে পরিচিত এই নামটি। চে দশকের পর দশক, বছরের পর বছর জুড়ে রয়ে গেছেন তারুণ্যের প্রতীক হয়ে। যে তরুণ স্বপ্ন দেখে, যে তরুণ সবার জন্য সমান একটি পৃথিবীকে আলিঙ্গন করতে চায়, তার সবচেয়ে বড় অবলম্বন চে।

ক. 'কিংবদন্তি' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'তার করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল' –কেন?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করুন।

ঘ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার মূল ভাব প্রকাশ করে কী? –আপনার মন্তব্যের সপক্ষে কিংবা বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক.

যে সাঁতার জানে না প্রবহমাণ নদী তাকে ভাসিয়ে রাখে।

খ.

বংশপরম্পরায় যারা অন্যের দ্বারা শাসিত হয় কবিতায় তাদেরকে ক্রীতদাস বলা হয়েছে।

ক্রীতদাস হলো মনিবের অর্থে ক্রয় করা মানুষ। মনিব দাসকে যা করতে বলে ক্রীতদাস সেটা করতে বাধ্য থাকে। আলোচ্য কবিতায় আমাদের পিতা-পিতামহগণ ঔপনিবেশিক শক্তির হাতে বাধা ছিলেন। তারা নিজের জমিতে ফসল ফলালেও সেটা নিজেদের মত করে ভোগ করতে পারতেন না। শত্রুশক্তির সঙ্গে পেরে উঠতে না পেরে তারা নির্জীব পাথরের মতো নিজেদের জীবন অতিবাহিত করতেন। প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে তারা প্রভুর শক্তিকে নিয়তি মনে করে সব নির্যাতন মুখ বুঁজে সহ্য করতেন। এজন্য কবিতায় পূর্বপুরুষদের ক্রীতদাস বলা হয়েছে।

গ.

'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় বর্ণিত স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিষয়টি উদ্দীপকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় কবি প্রতারক ও অত্যাচারী ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কথা বলেছেন। জনতা যখন এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তখন সম্মিলিত কণ্ঠে প্রতিবাদের ভাষা ধ্বনিত হয়। কবির উপলব্ধিতে সে প্রতিবাদের ধ্বনি বজ্রকণ্ঠের ন্যায়। আর মাহাত্ম্য গুণে সে প্রতিবাদের ভাষাই হয়ে উঠে কবিতা।

কবিতায় কবি বলেছেন, তিনি তাঁর পূর্বপুরুষের কথা থেকে তাঁদের সংগ্রামী ইতিহস ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন। সে ইতিহাস ক্রীতদাসের জীবন থেকে মুক্তিলাভের ইতিহাস। কবি বলেছেন, যখন যুদ্ধ আসে তখন মায়ের ছেলেরা যুদ্ধে চলে যায়। যুদ্ধের সময় মা-বোনের মৃত্যু হয়, জনবসতি ও ছাত্রাবাস ধ্বংস হয়। কিন্তু সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধারণ করে মহা আনন্দে মুক্তিকে ছিনিয়ে আনে মায়ের ছেলেরা। অন্যদিকে উদ্দীপকে স্বাধীনতাকে দেখা হয়েছে কৃষকের মুখের হাসির মধ্য দিয়ে। এখানে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতারও স্বাধীনতার মোহময় প্রকাশ। তাই উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের সঙ্গে ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ.

উদ্দীপক ও ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় স্বাধীনতার আনন্দময় মুক্তজীবনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় কবির মতে নিবেদিতপ্রাণ প্রত্যেক কৃষকই কবি। কবিতা কৃষকের পতিত জমি আবাদের প্রেরণা যোগায়। কবিতা শোনা মানুষ মুক্তমনে মাছের সঙ্গে খেলা করতে পারে। আর মায়ের কোলে শুয়ে গল্প করতে পারে।

উদ্দীপকে স্বাধীনতার আনন্দকে কৃষকের মুখের হাসির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কৃষকের শস্যক্ষেতে ফলন ভালো হলে তার মুখে হাসি ফোটে। এই নির্মল হাসি স্বাধীনতার প্রতীক। উদ্দীপকে গ্রাম্য মেয়ের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে স্বাধীনতাকে খোঁজা হয়েছে। উদ্দীপকের কবির মতে রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে অবাধ সাঁতার কাটাও স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ। অন্যদিকে ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় কবি তাঁর পূর্বপুরুষদের সংগ্রামী ও গৌরবময় জীবনের ইতিহাস বলেছেন। কবির মতে কবিতা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে, মুক্তজীবনের স্বপ্ন দেখায়।

উদ্দীপকে কৃষকের হাসিমাখা মুখে মুক্তজীবনের আনন্দ ফুটে উঠেছে। গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার কাটাতেও স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। উদ্দীপকের কবির মতে স্বাধীনতা হলো আনন্দময় মুক্তজীবনের প্রতীক। ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায়ও উল্লিখিত ‘কবিতা’ শব্দটি আনন্দময় মুক্তজীনের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই উদ্দীপক ও কবিতার আলোকে বলা যায়, স্বাধীনতায় আনন্দময় জীবনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে
আমি তো এসেছি সওদাগরের ডিঙ্গার বহর থেকে।
আমি তো এসেছি কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে
আমি তো এসেছি পাল যুগ নামে চিত্রকলা থেকে।

ক. কে আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে?
খ. ‘সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখা’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
গ. উদ্দীপকটি কোন দিক থেকে ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? –ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. “উদ্দীপকে ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার মূলভাব পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হয়নি।” –মন্তব্যটি বিচার করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. গ ৩. গ ৪. ঘ ৫. খ ৬. ঘ ৭. খ ৮. গ ৯. ঘ ১০. ক ১১. গ ১২. ঘ

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়

সৈয়দ শামসুল হক

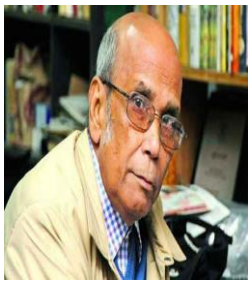

কবি-পরিচিতি

সৈয়দ শামসুল হক ১৯৩৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর কুড়িগ্রাম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ডা. সৈয়দ সিদ্দিক হুসাইন এবং মা সৈয়দা হালিমা খাতুন। তিনি ১৯৫০ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং এক বছর বিরতি দিয়ে জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন ও সেখান থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হয়ে কিছুদিন পড়াশুনা করেন কিন্তু তা শেষ করেননি। কর্মজীবনের প্রথমে কিছুদিন সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিছুদিন ছিলেন বিবিসি বাংলা বিভাগের প্রযোজক। পরে তিনি লেখালেখিকে একমাত্র ব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরে ব্যক্তিগত খাতায় তিনি প্রায় দুইশটির মতো কবিতা লিখে ফেলেন। কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, চিত্রকর, ভাস্কর এবং আরো বিচিত্র সাহিত্য-শিল্পধারার কীর্তিমান স্রষ্টা তিনি। সব্যসাচী লেখক হিসেবে তিনি অধিক পরিচিত। অবিরাম বিচিত্রতার পথে চলমান এই কবি ও লেখকের সৃষ্টিতে উঠে এসেছে নানা বিষয়। আঞ্চলিক ক্রিয়াপদের চমৎকার ব্যবহার শুধু কাব্যনাট্যেই নয়, কোনো কোনো কবিতায় তিনি সচেতনভাবেই ব্যবহার করেছেন। শুধু লেখক বা কবি হিসেবেই নয়, দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে একজন প্রগতিশীল মানুষ হিসেবে তিনি এখনো ভূমিকা রেখে চলেছেন। মাত্র ২৯ বছর বয়সে তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান। এছাড়াও তিনি একুশে পদক, স্বাধীনতা পদক, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, নাসিরুদ্দিন স্বর্ণপদকসহ বিভিন্ন পরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কাব্যগ্রন্থ : *একদা এক রাজ্যে* (১৯৬১), *বিরতিহীন উৎসব* (১৯৬৯), *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা* (১৯৭০), *প্রতিধ্বনিগণ* (১৯৭৩), পরাণের গহীন ভিতর (১৯৮০), রজ্জুপথে চলেছি (১৯৮৮), *আমি জন্মগ্রহণ করিনি* (১৯৯০), *রাজনৈতিক কবিতা* (১৯৯১);

ছোটগল্প : *তাস* (১৯৫৪), *রক্তগোলাপ* (১৯৬৪), *প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান* (১৯৮২), *শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৯০);

উপন্যাস : *এক মহিলার ছবি* (১৯৫৯), *সীমানা ছাড়িয়ে* (১৯৬৪), বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ (১৯৮৯), *খেলারাম খেলে যা* (১৯৯১);

কাব্যনাটক : *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (১৯৭৬), *গণনায়ক* (১৯৭৬), *নূরলদীনের সারাজীবন* (১৯৮২);

শিশুতোষ : *সীমান্তের সিংহাসন* (১৯৮৮)।

ভূমিকা

সৈয়দ শামসুল হকের বিখ্যাত 'নূরলদীনের সারাজীবন' শীর্ষক কাব্যনাটক থেকে রচনাটি সংকলিত হয়েছে। এটি এই নাটকের প্রস্তাবনা অংশ। কবি এই রচনায় ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সাহসী কৃষক নেতা নূরলদীনের সাহস ও ক্ষোভকে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে অসামান্য নৈপুণ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন। তিনি নূরলদীনকে চিরায়ত প্রতিবাদের প্রতীকে উপস্থাপন করেছেন।

উদ্দেশ্য

সৈয়দ শামসুল হকের 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটি পড়ার পর আপনি–

- নূরলদীনের সংগ্রামী জীবনের কথা নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন।
- বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে কবি কীভাবে নূরলদীনের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের চেতনাগত মিল খুঁজে পেয়েছেন তা আলোচনা করতে পারবেন।
- "জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়" –উক্তিটির প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

নিলক্ষা আকাশ নীল, হাজার হাজার তারা ঐ নীলে অগণিত আর
নিচে গ্রাম, গঞ্জ, হাট, জনপদ, লোকালয় আছে উনসত্তর হাজার।
ধবল দুধের মতো জ্যোৎস্না তার ঢালিতেছে চাঁদ-পূর্ণিমার।
নষ্ট ক্ষেত, নষ্ট মাঠ, নদী নষ্ট, বীজ নষ্ট, বড় নষ্ট যখন সংসার
তখন হঠাৎ কেন দেখা দেয় নিলক্ষার নীলে তীব্র শিস
দিয়ে এত বড় চাঁদ?
অতি অকস্মাৎ
স্তব্ধতার দেহ ছিঁড়ে কোন ধ্বনি? কোন শব্দ? কিসের প্রপাত?
গোল হয়ে আসুন সকলে,
ঘন হয়ে আসুন সকলে,
আমার মিনতি আজ স্থির হয়ে বসুন সকলে।
অতীত হঠাৎ হাতে হানা দেয় মানুষের বন্ধ দরোজায়
এই তীব্র স্বচ্ছ পূর্ণিমায়
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
কালঘুম যখন বাংলায়
তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে আবার নূরলদীন দেখা দেয় মরা আঙিনায়।
নূরলদীনের বাড়ি রংপুরে যে ছিল,
রংপুরে নূরলদীন একদিন ডাক দিয়েছিল
১১৮৯ সনে।
আবার বাংলার বুঝি পড়ে যায় মনে,
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালেরই আলখাল্লায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমার কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমারই দেশে এ আমার দেহ থেকে রক্ত ঝরে যায়
ইতিহাসে, প্রতিটি পৃষ্ঠায়।
আসুন, আসুন তবে, আজ এই প্রশস্ত প্রান্তরে;
যখন স্মৃতির দুধ জ্যোৎস্নার সাথে ঝরে পড়ে,
তখন কে থাকে ঘুমে? কে থাকে ভেতরে?
কে একা নিঃসঙ্গ বসে অশ্রুপাত করে?

সমস্ত নদীর অশ্রু অবশেষে ব্রহ্মপুত্রে মেশে।
নূরলদীনেরও কথা যেন সারা দেশে
পাহাড়ি ঢলের মতো নেমে এসে সমস্ত ভাসায়,
অভাগা মানুষ যে জেগে ওঠে আবার এ আশায়
যে, আবার নূরলদীন একদিন আসিবে বাংলায়,
আবার নূরলদীন একদিন কাল পূর্ণিমায়
দিবে ডাক, "জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?"

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অকস্মাৎ– সহসা, হঠাৎ। **কালঘুম–** মৃত্যু, চিরনিদ্রা। **কোনঠে–** কোথায়। **ধবল–** শুভ্র, সাদা। **ধবল দুধের মতো জ্যোৎস্না–** সাদা দুধের মতো জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার রঙকে দুধের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। **নিলক্ষা–** দৃষ্টিসীমা অতিক্রমী। **প্রপাত–** নির্ঝরের পতনের স্থান, জলপ্রপাত। **প্রান্তর–** বিস্তীর্ণ মাঠ, যে বড় মাঠে গাছপালা বা বসতি নেই। **বাহে–** বাপুহে, দিনাজপুর, রংপুর এলাকার সম্বোধন বিশেষ। **বাজেয়াপ্ত–** সরকার কর্তৃক কোনো কিছু নিয়ে নেওয়া বা অধিকৃত। **মরা আঙিনায়–** মৃত্যু নিথর অঙ্গনে। **মিনতি–** অনুনয়, বিনয়। **স্তব্ধতার দেহ–** এখানে নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশ বোঝানো হয়েছে। **হানা দেয়–** আক্রমণ করে, আবির্ভূত হয় অর্থে ব্যবহৃত।

সারসংক্ষেপ

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটির মাধ্যমে কবি সৈয়দ শামসুল হক নাট্যকাহিনিকে দর্শকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছেন। সাহসী কৃষক নেতা নূরলদীনের সংগ্রামের কথা ১৭৮৩ সালে (১১৮৯ বঙ্গাব্দ) রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। কবি বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নূরলদীনের সাহস এবং ক্ষোভকে অসামান্য দক্ষতায় মিলিয়ে দেখিয়েছেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে নয়টি মাস ধরে বাংলাদেশকে পাকিস্তানি হায়েনারা মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে। ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠা যখন রক্তে রঞ্জিত হতে থাকে তখন কবির মনে পড়ে ইতিহাসের প্রতিবাদী নায়ক নূরলদীনকে। ১৭৮৩ সালে নূরলদীনের ডাকে মানুষ যেভাবে জেগেছিল, কবির বিশ্বাস এখনো মানুষকে সেভাবে জাগতে হবে। নূরলদীন হয়ে ওঠে এক চিরায়ত প্রতিবাদের প্রতীক। ইতিহাসের পাতা থেকে নূরলদীন মিশে যায় বাংলার শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের ভিড়ে। কবির প্রত্যাশা, ভাগ্য বিড়ম্বিত মানুষ নূরলদীনের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে একদিন পাহাড়ি ঢলের মতো ভাসিয়ে দেবে সকল অনিয়ম, যখন নূরলদীন দেবে ডাক– "জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়।"

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কৃষকনেতা ছিলেন কে?

ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য
খ. নূরলদীন
গ. নূরুলদীন
ঘ. শামসুল হক

২. 'কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত' বলতে বোঝানো হয়েছে–

ক. লেখার স্বাধীনতা হরণ
খ. চিন্তার স্বাধীনতা লঙ্ঘন
গ. বাক স্বাধীনতা হরণ
ঘ. রাজনীতির স্বাধীনতায় বাধা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মুক্তিযুদ্ধের সময় পলি ভাবীকে এদেশের ঘৃণ্য দালালদের সহযোগিতায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয় রাজাকারদের ক্যাম্পে। সপ্তাহান্তে তার লাশ পাওয়া যায় পার্শ্ববর্তী নালাতে। পলি ভাবীর অপরাধ তিনি রাজাকারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন।

৩. উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার কোন চরণের সাদৃশ্য রয়েছে–

ক. যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়
খ. যখন আমার কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়
গ. যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়
ঘ. যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালেরই আলখাল্লায়

৪. উদ্দীপক ও 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় ফুটে উঠেছে–

i. রাজাকারদের দালালি
ii. স্বাধিকার আন্দোলন
iii. বাক্‌স্বাধীনতা হরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'কোনঠে' শব্দের প্রমিত রূপ কোনটি?

ক. কেন
খ. কবে
গ. কোথায়
ঘ. কখন

৬. 'বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম' বলতে বোঝায় যে যুদ্ধকে–

ক. ১৯৫২
খ. ১৯৫৪
গ. ১৯৬৯
ঘ. ১৯৭১

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।

৭. উদ্দীপকের কবির সঙ্গে আপনার পঠিত কবিতায় কার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. নূরুলদীন
খ. রবীন্দ্রনাথ
গ. মাহমুদ দীন
ঘ. নূরলদীন

৮. এরূপ সাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে–

ক. ধর্মীয় চেতনা
খ. মুক্তির প্রত্যাশা
গ. ভাষার সংগ্রাম
ঘ. সংস্কৃতির লড়াই

সৃজনশীল প্রশ্ন :

তিতুমির বাংলার একজন অকুতোভয় বীর। তিনি ভারতবর্ষে অন্যায়, নিপীড়ন আর শোষণবিরোধী সংগ্রামের ছবি । ঔপনিবেশিক শক্তি ইংরেজ আর স্থানীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই এখনও এ মাটির সন্তানদের বুকে শিহরণ জাগায়। এদেশ এখনও নানা সংকট ও সংগ্রামে তাঁকে স্মরণ করে। তিতুমির আমাদের জাতীয় চেতনার প্রতীক।

ক. 'নিলক্ষ' শব্দের অর্থ কী?
খ. নূরলদীন ইতিহাসে বিখ্যাত কেন?
গ. উদ্দীপকটি 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার সঙ্গে কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ? –তুলে ধরুন।
ঘ. "উদ্দীপকে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার পূর্ণ অনুরণন ঘটেনি।" –আলোচনা করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক.

'নিলক্ষ' শব্দের অর্থ দৃষ্টিসীমা অতিক্রমকারী।

খ.

বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার কারণে নূরলদীন ইতিহাসে বিখ্যাত।

নূরলদীনের বাড়ি রংপুরে। তিনি একজন বিপ্লবী পুরুষ। নূরলদীন ১৭৮৩ সালে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ সারা বাংলায় সাড়া জাগিয়েছিল। নূরলদীন শোষকের বিরুদ্ধে বাংলার প্রতিবাদী চেতনার প্রতীক।

গ.

উদ্দীপকের তিতুমিরের সঙ্গে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীনের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে।

নূরলদীন রংপুরের একজন কৃষক নেতা। তিনি রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে সামন্তবাদবিরোধী কৃষক আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। ১৭৮৩ সালে নূরলদীনের ডাকে সে অঞ্চলের কৃষক-জনতা জেগে উঠেছিল। তিনি ব্রিটিশশাসিত বাংলায় মুক্তিচেতনার প্রতীক। কবি সৈয়দ শাসুল হক ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নূরলদীনের চেতনাকে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে অসামান্য নৈপুণ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন।

উদ্দীপকের ঐতিহাসিক চরিত্র তিতুমির আমাদের জাতীয় চেতনার প্রতীক। তিনি ছিলেন সামন্তবাদবিরোধী আন্দোলনের এক লড়াকু সৈনিক। তিতুমির ইংরেজ শাসন ও জমিদারদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এদেশবাসীকে লড়াই করার ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর সে আহ্বান ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল। 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কবি একজন সাহসী কৃষকনেতা নূরলদীনকে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বাংলাদেশের রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। স্থানীয় সাধারণ মানুষকে একত্রিত করে তিনি বৃটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। সুতরাং বলা যায়, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের দিক থেকে উদ্দীপক এবং 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ.

উদ্দীপকে তিতুমিরকে জাতীয় চেতনার প্রতীক হিসাবে স্মরণ করা হয়েছে যা 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার পূর্ণ অনুরণন ঘটায় না।

নূরলদীন রংপুর অঞ্চলের একজন কৃষকনেতা। তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৭৮৩ সালে তাঁর ডাকে সাধারণ মানুষ জেগে উঠেছিল। আলোচ্য কবিতায় কবি নূরলদীনের সেই ডাকের প্রত্যাশা করেছেন যে ডাক শুনে সাধারণ মানুষ আবার সকল অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

উদ্দীপকে তিতুমিরকে বাঙালির জাতীয় বীর হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ভারতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বীর সেনানী। সামন্তবাদবিরোধী আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তিতুমির বাঙালি জাতির সংগ্রামী চেতনায় চিরপ্রেরণার উৎস। 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কবি সৈয়দ শামসুল হক একজন বীর সেনানী রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের কৃষকনেতা নূরলদীনের কথা বলেছেন। তাঁর সংগ্রামী চেতনা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সৈয়দ শামসুল হক নূরলদীনের ব্রিটিশবিরোধী চেতনাকে শিল্পকৌশলে মিশিয়ে দিয়েছেন বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে। কবি মনে করেন নূরলদীনের একটি ডাকই পারে দেশ থেকে অন্যায় ও অনাচার দূর করতে।

উদ্দীপকে তিতুমির বাঙালির জাতীয় চেতনার প্রতীক। জাতির নানা সংকট, সংগ্রাম ও আন্দোলনে মানুষ এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কবির হৃদয়ে একটি প্রত্যাশা কাজ করেছে। কবির এই প্রত্যাশা হচ্ছে নূরলদীন আবার ফিরে আসবেন। তিনি ফিরে আসবেন দেশের আপামর শ্রমজীবী মানুষকে জাগাতে। আর এভাবেই বাংলা

থেকে অবসান হবে সকল অন্যায় ও অত্যাচারের। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার পূর্ণ অনুরণন ঘটেনি।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

ম্যাক্সিম গোর্কীকে সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় তার কারণ এই নয় যে গোর্কী সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রতিভা ছিলেন। তাঁকে এই আখ্যা দেওয়ার কারণ পূর্ববর্তীদের মতো সমাজের দুঃখ-দুর্দশা দেখে করুণা আপ্লুত হয়ে তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি। তিনি তা করেছিলেন সচেতনভাবে। শ্রেণিসংগ্রামের বাস্তব চিত্রকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরে তিনি তাদের সেই সংগ্রামকে তার পরিণতির দিকে এগিয়ে নিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

ক. নূরলদীনের বাড়ি কোথায় ছিল?

খ. 'কালঘুম যখন বাংলায়' –কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকটি 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার কোন বিষয়টির প্রতিনিধিত্ব করে? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকে নূরলদীনের বিপ্লবী চেতনার সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে।" –'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. গ ৩. ঘ ৪. ক ৫. গ ৬. ঘ ৭. ক ৮. খ

লোক-লোকান্তর

আল মাহমুদ

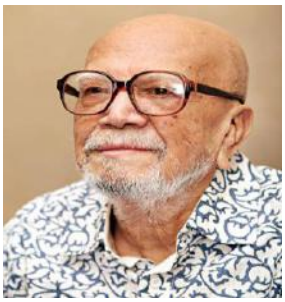

কবি-পরিচিতি

আল মাহমুদ ১৯৩৬ সালে ১১ জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মৌড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মীর আব্দুস শুকুর আল মাহমুদ। তাঁর পিতা আদুর রব মীর ও মাতা রওশন আরা মীর। আল মাহমুদ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় লেখাপড়া করেছেন। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গঠিত ভাষা-কমিটির প্রচারিত লিফলেটে তাঁর চার লাইন কবিতা ছাপা হয় এবং সে-কারণে পুলিশের হয়রানিতে ঢাকায় পলায়ন করেন ও প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখার সমাপ্তি ঘটে। তিনি স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে *দৈনিক মিল্লাত*, *সাপ্তাহিক কাফেলা* ও *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় কাজ করেছেন এবং পরে *দৈনিক গণকণ্ঠ* ও *দৈনিক কর্ণফুলী* পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিচালক হিসেবে ১৯৯৩ সালে অবসরে যান। আধুনিক বাংলা কবিতায় আল মাহমুদ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি ভাটি-বাংলার জনজীবন, গ্রামীণ দৃশ্যপট, নদীনির্ভর জনপদ, চরাঞ্চলের কর্মমুখর জীবন চাঞ্চল্য ও নর-নারীর চিরন্তন প্রেম-বিরহকে অবলম্বন করে কাব্যসাধনা করেছেন। তাঁর লেখায় অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততায় লোকজ ও আঞ্চলিক শব্দের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। কবিতার পাশাপাশি কথাসাহিত্যেও তিনি সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কাব্যগ্রন্থ : *লোক-লোকান্তর* (১৯৬৩), *কালের কলস* (১৯৬৬), *সোনালী কাবিন* (১৯৬৬), *মায়াবি পর্দা দুলে ওঠে* (১৯৭৬), *অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না* (১৯৮০), *বখতিয়ারের ঘোড়া* (১৯৮৬), *আরব্য রজনীর রাজহাঁস* (১৯৮৭);

ছোটগল্প : *পানকৌড়ির রক্ত* (১৯৭৫), *সৌরভের কাছে পরাজিত* (১৯৮২), *গন্ধবণিক* (১৯৮৮), *ছোট বড়* (২০০৬);

উপন্যাস : *ডাহুকী* (১৯৯২), *কবি ও কোলাহল* (১৯৯৩), *নিশিন্দা নারী* (১৯৯৫), *আগুনের মেয়ে* (১৯৯৫);

শিশুতোষ : *পাখির কাছে ফুলের কাছে* (২০০২)।

ভূমিকা

'লোক-লোকান্তর' আল মাহমুদ রচিত 'লোক লোকান্তর' কাব্যের নামকবিতা। এটি কবির আত্মপরিচয়মূলক কবিতা। কবির উল্লেখযোগ্য সনেটের মধ্যে এটি একটি। এর অষ্টকে বাংলার অপরূপ রূপের সঙ্গে কবির সম্পর্ক ফুটে উঠেছে। আর ষটকে ক্ষণস্থায়ী জীবনের কথা এবং সৃষ্টকর্মের মাধ্যমে বেঁচে থাকার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

উদ্দেশ্য

আল মাহমুদের 'লোক-লোকান্তর' কবিতাটি পড়ার পর আপনি–

- 'লোক-লোকান্তর' কবিতা অবলম্বনে প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে পারবেন।
- কবি তাঁর কাব্যবোধ ও কাব্যচেতনাকে কীভাবে পাখির প্রতিমায় উপস্থাপন করেছেন, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কবিতার আসন্ন বিজয়ের মধ্য দিয়ে কবির বিচ্ছিন্নতাবোধের বেদনা কীভাবে প্রশমিত হয়েছিল, তা লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

আমার চেতনা যেন একটি শাদা সত্যিকার পাখি,
বসে আছে সবুজ অরণ্যে এক চন্দনের ডালে;
মাথার ওপরে নিচে বনচারী বাতাসের তালে
দোলে বন্য পানলতা, সুগন্ধ পরাগে মাখামাখি
হয়ে আছে ঠোঁট তার। আর দুটি চোখের কোটরে
কাটা সুপারির রং, পা সবুজ, নখ তীব্র লাল
যেন তার তন্ত্রে মন্ত্রে ভরে আছে চন্দনের ডাল
চোখ যে রাখতে নারি এত বন্য ঝোপের ওপরে।
তাকাতে পারি না আমি রূপে তার যেন এত ভয়
যখনি উজ্জ্বল হয় আমার এ চেতনার মণি,
মনে হয় কেটে যাবে, ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি
সংসার সমাজ ধর্ম তুচ্ছ হয়ে যাবে লোকালয়।
লোক থেকে লোকান্তরে আমি যেন স্তব্ধ হয়ে শুনি
আহত কবির গান। কবিতার আসন্ন বিজয়।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

আমরা চেতনা যেন একটি শাদা সত্যিকার পাখি,
বসে আছে সবুজ অরণ্যে এক চন্দনের ডালে

–কবি তাঁর কাব্যবোধ ও কাব্যচেতনাকে সাদা এক সত্যিকার পাখির প্রতিমায় উপস্থাপন করেছেন। কবির এই চেতনা-পাখি বসে আছে সবুজ অরণ্যের কোনো এক চন্দনের ডালে। এই চন্দন সুগন্ধি কাঠের গাছ। আর এর ফুল ঝাল-মিষ্টি লবঙ্গ। কবির কাব্যসত্তার মধুরতার সঙ্গে চন্দনের সম্পর্ক নিহিত।

আর দুটি চোখের কোটরে
কাটা সুপারির রং, পা সবুজ, নখ তীব্র লাল
যেন তার তন্ত্রে মন্ত্রে ভরে আছে চন্দনের ডাল
চোখ যে রাখতে নারি এত বন্য ঝোপের ওপরে

–কবির অস্তিত্ব জুড়ে চিরায়ত গ্রামবাংলা, দৃষ্টিতে কাটা সুপারির রং। এ যেন চিরায়ত বাংলার রূপ। যতদূর চোখ যায়, কেবল চোখে পড়ে বাংলার অফুরন্ত রং। তার পা সবুজ, নখ তীব্র লাল– এ যেন মাটি আর আকাশে মেলে ধরা কবির নিসর্গ-উপলব্ধির অনিন্দ্য প্রকাশ। আর সেই সমবেত সৌন্দর্যের তন্ত্রে-মন্ত্রে, রহস্যময়তায় ভরে উঠেছে কবির সৃষ্টি।

আসন্ন– আগত প্রায়, নিকটবর্তী।

চন্দন– স্বনামখ্যাত সুগন্ধি কাঠ বিশেষ ও তার গাছ।

তাকাতে পারি না আমি রূপে তার যেন এত ভয়
যখনি উজ্জ্বল হয় আমার এ চেতনার মণি,
মনে হয় কেটে যাবে, ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি
সংসার সমাজ ধর্ম তুচ্ছ হয়ে যাবে লোকালয়।
লোক থেকে লোকান্তরে আমি যেন স্তব্ধ হয়ে শুনি
আহত কবির গান। কবিতার আসন্ন বিজয়।

–সৃষ্টির প্রেরণায় কবি চিরকালই উদ্বুদ্ধ হন, উজ্জ্বল হয় তাঁর চেতনার মণি। পৃথিবীর কোনো বিধিবিধান, কোনো নিয়মকানুন, কোনো ধর্ম, কোনো সমাজ-সংস্কার বা লোকালয়ের অধীন তিনি আর তখন থাকেন না। তখন সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়। একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে চেতনার জগৎ, শব্দসৌধ। তাঁর সেই সৃষ্টির পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বিচিত্র টানাপড়েন ও জীবন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে তাকে উত্তীর্ণ হতে হয় কবিতার সার্বভৌমত্বে এবং জয় হয় কবিতার।

পরাগ– ফুলের রেণু।

মাথার ওপরে নিচে বনচারী বাতাসের তালে
দোলে বন্য পানলতা, সুগন্ধ পরাগে মাখামাখি
হয়ে আছে ঠোঁট তার।

–চন্দনের ডালে বসে থাকা কবির চেতনা-পাখির ওপরে-নিচে বনচারী বাতাসের সঙ্গে দোল খায় পানলতা। প্রকৃতির এই রহস্যময়-সৌন্দর্যের মধ্যে সুগন্ধি পরাগে মাখামাখি হয়ে ওঠে কবির ঠোঁট, অস্তিত্বের স্বরূপ, কাব্যভাষা।

লোকান্তর– ভিন্ন জগৎ, অন্যলোক।

শাদা– সাদা, সফেদ।

সারসংক্ষেপ

কবি আল মাহমুদের 'লোক-লোকান্তর' আত্মপরিচয়মূলক কবিতা। এ কবিতায় কবি নিজের অভিব্যক্তিকে প্রকৃতির সাথে একাত্ম করে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি প্রকাশ করেছেন কাব্যচেতনার স্বরূপ। কবি সাদা এক সত্যিকার পাখির প্রতিমায় উপস্থাপন করেছেন তাঁর কাব্যবোধ ও কাব্যচেতনাকে। কবির এই চেতনা-পাখি বসে আছে সবুজ অরণ্যের কোনো এক চন্দনের ডালে। কবির কাছে একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে চেতনার জগৎ, চেতনার রং-রূপ-রেখা। এ কবিতায় এক সুগভীর বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণা কবিকে কাতর করে, আহত করে। তবু কবি সৃষ্টির আনন্দকে উপভোগ করতে আগ্রহী। পৃথিবীর কোনো নিয়ম-কানুন, ধর্ম, সমাজ-সংস্কার, লোকালয়, কোনো বিধিবিধানের অধীনে তিনি আর থাকেন না। তিনি বিচিত্র টানাপোড়েন এবং জীবন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে উত্তীর্ণ হন কবিতার সার্বভৌমত্বে এবং জয় হয় কবিতার। এ কবিতায় কবি চিত্রকল্পের মালা গেঁথে তাঁর কাব্য চেতনাকে মূর্ত করে তুলতে চান। কবি সৃষ্টির এই আনন্দের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতাবোধের বেদনাকে প্রশমিত করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবি আল মাহমুদের প্রকৃত নাম কী?

ক. মীর আব্দুস শুকুর আল মাহমুদ
খ. মীর আবদুস শুকুর মাহমুদ
গ. মীর আব্দুল শুকুর আল মাহমুদ
ঘ. মীর শুকুর আল মাহমুদ

২. 'লোক-লোকান্তর' কাব্যগ্রন্থে কবি তাঁর চেতনাকে পাখির সঙ্গে তুলনা করেছেন কেন?

ক. পাখির মতো প্রাণবন্ত
খ. পাখির মতো ডাকাডাকি করে
গ. পাখা পেয়েছে বলে
ঘ. চেতনা উড়ন্ত বলে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

কবরী এলো করে আকাশ দেখার মুহূর্ত
অশেষ অনুভব নিয়ে পুলকিত স্বচ্ছলতা।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে 'লোক-লোকান্তর' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে–

ক. চিত্রকল্প নির্মাণে
খ. শব্দ বিন্যাসে
গ. আঙ্গিকে
ঘ. অনুপ্রাস সৃষ্টিতে

৪. উদ্দীপক ও 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় ফুটে উঠেছে–

i. প্রকৃতিপ্রীতি
ii. জীবন সংগ্রাম

iii. টানাপোড়েন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. ii ও iii

গ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. বনচারী বাতাসের তালে কী দোলে?

ক. উঁচু বৃক্ষশাখা　　খ. চন্দনের ডাল

খ. বন্য পানলতা　　ঘ. গাছের নিচু ডাল

৬. 'ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি' এখানে 'বাঁধুনি' বলতে বোঝানো হয়েছে–

ক. সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা　　খ. মনকে বেঁধে রাখা

গ. চেতনাকে আটকে রাখা　　ঘ. রাজনীতির জটিল বন্ধন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে 'লোক-লোকান্তর' কবিতার কোন চরণের?

ক. মনে হয় কেটে যাবে, ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি　　খ. চোখ যে রাখতে নারি এত বন্য ঝোপের ওপরি

গ. আমার চেতনা যেন একটি শাদা সত্যিকার পাখি　　ঘ. কাটা সুপারির রং, পা সবুজ, নখ তীব্র লাল

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

কবিতা রচনার অন্তরালে কাজ করে এক সৃষ্টিশীল গতিময় প্রেরণা। তখন কবির কাছে সমাজ, সংসার, ধর্ম সব কিছুই অন্যরকম মনে হয়।

৮. উদ্দীপক ও 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে–

i. কবিতা সৃষ্টির গুরুত্ব

ii. কবিতার জন্মকথা

iii. কবির কল্পনাপ্রবণতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

গীতিকবিতার একটি বিশেষ প্রকরণ সনেট। সনেটে সাধারণত চৌদ্দটি পংক্তি এবং প্রতি পংক্তিতে চৌদ্দটি মাত্রা থাকে। তবে আঠারো মাত্রার সনেটও প্রচলিত রয়েছে। সনেটের প্রথম আট পংক্তির স্তবককে অষ্টক এবং শেষ ছয় পংক্তির স্তবককে ষটক বলা হয়। অষ্টকে থাকে ভাবের প্রবর্তনা আর ষটকে তার পরিণতি। অষ্টক আর ষটক মিলিয়ে সনেটে একটি অখণ্ড ভাবকল্পনা বিকশিত হয়।

ক. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কোনটিকে সাদা পাখি বলা হয়েছে?

খ. সমাজ-সংসার কখন তুচ্ছ হয়ে ওঠে?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পংক্তিবিন্যাস 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কীভাবে প্রযুক্ত হয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "আল মাহমুদ রচিত 'লোক-লোকান্তর' কবিতাটিকে একটি সনেট হিসাবে বিবেচনা করা যায়।" –উদ্দীপক ও কবিতার আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক

'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবি তাঁর চেতনাকে সাদা পাখি বলেছেন।

খ.

কবির কাছে যখন তাঁর চেতনার জগৎ একমাত্র সত্য হয়ে উঠে তখন সমাজ-সংসার সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়।

'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবি আল মাহমুদ সৃষ্টিশীল প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। এখানে তাঁর চেতনার মণি উজ্জ্বল হয়েছে। এ সময়ে কবি পৃথিবীর কোনো বিধিবিধান, কোনো নিয়মকানুন, কোনো ধর্ম, কোনো সমাজ-সংস্কার বা লোকালয়ের অধীন থাকেন না। এ সময় সমাজ-সংসার সবকিছুই তাঁর নিকট অর্থহীন হয়ে ওঠে। তাঁর নিকট একমাত্র সত্য হয়ে উঠে চেতনার রঙ, চেতনার রূপরেখা। আর কবি পরম আনন্দে গড়ে তোলেন তাঁর প্রেরণার শব্দসৌধ। একেই বলা হয়েছে সমাজ-সংসার তুচ্ছ হয়ে উঠা।

গ.

উদ্দীপকে বর্ণিত সনেটের পংক্তিবিন্যাসের সঙ্গে 'লোক-লোকান্তর' কবিতার পংক্তিবিন্যাসের সাদৃশ্য রয়েছে।

'লোক-লোকান্তর' একটি বিশেষ ধরণের গীতিকবিতা। কবিতাটি একটি মাত্র অখণ্ড ভাবকল্পনা বা অনুভূতি আঠার মাত্রার সমন্বয়ে বিশেষ আঙ্গিক ও ছন্দরীতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভাবগত দিক থেকে এর মধ্যে দুটি স্তবক দেখা যায়– প্রথম আট পংক্তি নিয়ে গঠিত অষ্টকে ভাবের বিস্তার এবং শেষ ছয় পংক্তি নিয়ে রচিত ষটকে ভাবের পরিণতি।

উদ্দীপকে সনেটের গঠন কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে একটি আদর্শ সনেটে চৌদ্দটি পংক্তি থাকবে। এই পংক্তিগুলো আট ও ছয় পংক্তির দুটি স্তবকে বিন্যস্ত হয়। আরো বলা হয়েছে সনেটের প্রতিটি পংক্তি সাধারণত চৌদ্দ মাত্রায় গঠিত হয়। তবে আঠারো মাত্রার সনেটেরও প্রচলন রয়েছে। 'লোক-লোকান্তর' কবিতায়ও চৌদ্দটি পংক্তি রয়েছে। এর পংক্তিগুলো আট ও দশ মাত্রার দুটি পর্বে গঠিত। দুটি পর্ব মিলিয়ে মোট মাত্রা সংখ্যা হচ্ছে আঠারো। যেমন–

মাথার ওপরে নিচে বনচারী বাতাসের তালে ৮+১০=১৮
দোলে বন্য পানলতা সুগন্ধি পরাগে মাখা মাখি ৮+১০=১৮

এছাড়া 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় সনেটের গঠনরীতি অনুযায়ী আট পংক্তির অষ্টক এবং ছয় পংক্তির ষটক-এরও বিন্যাস দেখা যায়। উপরের আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় সুপ্রযুক্ত হয়েছে।

ঘ.

আল মাহমুদ রচিত 'লোক-লোকান্তর' কবিতাটিকে একটি সনেট হিসাবে বিবেচনা করা যায়– মন্তব্যটি যথার্থ।

সনেট গীতিকবিতার একটি বিশেষ রূপ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে প্রথম সনেট রচনা করেন। তিনি সনেটের নাম দিয়েছিলেন চতুর্দশপদী কবিতা। সনেটে সাধারণত চৌদ্দটি পংক্তি ও মাত্রা থাকে। অবশ্য আঠারো মাত্রার সনেটেরও প্রচলন রয়েছে। সনেটে একজন কবির ভাবকল্পনা অখণ্ডভাবে বিস্তার লাভ করে।

উদ্দীপকে সনেটের গঠনরীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে সনেটে সাধারণত চৌদ্দটি পংক্তি ও চৌদ্দটি মাত্রা থাকে। কখনো কখনো অবশ্য আঠারো মাত্রার পংক্তিও পরিলক্ষিত হয়। সনেটের চৌদ্দটি পংক্তি আবার আট ও ছয় পংক্তির দুটি স্তবকে বিন্যস্ত হয়। এর আট পংক্তির স্তবককে অষ্টক ও ছয় পংক্তির স্তবককে ষটক বলা হয়। অষ্টকে থাকে ভাবের বিস্তার আর ষটকে দেখা যায় তার পরিণতি। এভাবে ষটক আর অষ্টক মিলে সনেটে একটি অখণ্ড ভাব দ্যোতনা লাভ করে। কবি আল মাহমুদ রচিত 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় উদ্দীপকে উপস্থাপিত সনেটের গঠন কৌশল প্রযুক্ত হযেছে। অবশ্য কবি এ কবিতায় আঠারো মাত্রার পংক্তি ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ হিসাবে 'লোক-লোকান্তর' কবিতার দুটি চরণ উল্লেখ করা যায়–

মনে হয় কেটে যাবে, ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি ৮+১০=১৮
সংসার সমাজ ধর্ম তুচ্ছ হয়ে যাবে লোকালয়। ৮+১০=১৮

উদ্ধৃত পংক্তি দুটোতে আঠারোটি মাত্রা রয়েছে। পংক্তি দুটো আট ও দশ মাত্রার দুটি পর্বে গঠিত। এছাড়া কবিতায় পংক্তিগুলোর অষ্টক ও ষটকের বিন্যাস রয়েছে।

উদ্দীপকের আলোকে 'লোক-লোকান্তর' কবিতাটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এতে সনেটের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। কবিতায় কবি তাঁর চেতনাকে একটি অখণ্ড ভাবকল্পনায় প্রকাশ করেছেন। এখানে কবির ভাবকল্পনা হচ্ছে জীবনের যত সুখ-শান্তি, আনন্দ-উল্লাস সবই ক্ষণস্থায়ী। কবি সাদা পাখির প্রতীকে তাঁর এই ভাবচেতনাকে অনিন্দ্য সুন্দররূপে উপস্থাপন করেছেন। পরিশেষে বলা যায়, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু বিচারে 'লোক-লোকান্তর' একটি সার্থক সনেট।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

সে দিনে দেখিবে স্বপ্ন-
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে।
আমি চলে যাব বলে
চালতাফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের ঢেউয়ে?
লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে?
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে।

ক. 'লোক-লোকান্তর' কোন জাতীয় কবিতা?
খ. 'মাথার ওপরে নিচে বনচারী বাতাস' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'লোক-লোকান্তর' কবিতার সাদৃশ্য নির্ণয় করুন।
ঘ. "উদ্দীপকে 'লোক-লোকান্তর' কবিতার আংশিক ভাব প্রতিফলিত হয়েছে।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. ক ৩. ক ৪. ক ৫. গ ৬. ক ৭. গ ৮. ঘ